যাকাত ব্যবস্থাপনা ও দারিদ্র্যবিমোচন কৌশল

মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব পিএইচডি

যাকাত ব্যবস্থাপনা ও দারিদ্র্যবিমোচন কৌশল

মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব পিএইচডি

সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম)

যাকাত ব্যবস্থাপনা ও দারিদ্র্যবিমোচন কৌশল

Strategies of Zakat Management
& Poverty Alleviation

প্রকাশক
সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট
বাড়ি-২৬, সড়ক-০৭, নিকেতন, গুলশান-১
ঢাকা-১২১২

প্রকাশকাল
ফাল্গুন ১৪২৯
মার্চ ২০২৩
শাবান ১৪৪৪

কভার ডিজাইন
সালাহউদ্দিন আইয়ুব তিতু

অঙ্গসজ্জা
সালাহউদ্দিন আইয়ুব তিতু

মুদ্রণ
চৌকস প্রিন্টার্স
এসআর গার্ডেন (৪র্থ তলা)
৫২, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০
ঢাকা-১০০০

লেখকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তায়ালার অসীম রহমতে বিগত ২০১০ সাল থেকে অদ্যাবধি যাকাত ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত থাকার তৌফিক দিয়েছেন। সূচনাতে যাকাত সম্পর্কে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এবং যাকাতভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের অস্পষ্ট ধারণা নিয়েই কাজে নেমে পড়েছিলাম। শরীয়াহ বিশেষজ্ঞদের মূল্যবান পারমর্শ এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতার কারণে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে থাকি।

সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম)-কে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করানো এবং দারিদ্র্যবিমোচন ও মানব কল্যাণে টেকসই বিভিন্ন কর্মসূচি উদ্ভাবন করা ছিল প্রধান চ্যালেঞ্জ। আল্লাহর রহমতে আমরা শুরুতেই ২০১০-২০১৫ সময়ব্যাপী একটি দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরি করি। সঠিকভাবে মুস্তাহিক বাছাই, তাদের চাহিদা নিরূপণ, যাকাত তহবিল হস্তান্তর প্রক্রিয়া, তত্ত্বাবধান ও মনিটরিং ইত্যাদি বিষয়ে নানাবিধ কর্মকৌশল উদ্ভাবন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এসব বিষয়ে আবার শরীয়াহ বোর্ডের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়। সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো ও যাকাতভিত্তিক কর্মসূচি প্রণয়নের পরে তহবিল সংগ্রহের কাজটি ছিল বেশ দুরূহ। কারণ সমাজে বিদ্যমান যাকাতদাতাদের সাথে সাক্ষাত করে যাকাত ব্যবস্থাপনার বিষয়টি তুলে ধরা এবং তাদের আস্থা অর্জন করা সহজসাধ্য ছিল না। বহু চড়াই-উৎরাইয়ের পর সিজেডএম এখন অনেকের কাছেই একটি আস্থাভাজন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হয়েছে উঠেছে। বেসরকারি উদ্যোগে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাকাত ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম) পথিকৃতের ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

বাংলাদেশে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও এখানে ইসলামের অন্যতম ফরয ইবাদত যাকাত অনেক ক্ষেত্রেই যথাযথভাবে পরিপালিত হয় না। যাকাত সম্পর্কে জ্ঞানের স্বল্পতা এবং সমাজে যাকাতের গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার না থাকায় যাকাত-শিক্ষা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় সম্প্রসারিত হয়নি। দেশের বিভিন্ন প্রকার দ্বীনি প্রতিষ্ঠান এবং মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থাতেও যাকাত-শিক্ষা নামমাত্র রয়েছে। যাকাতের মাসয়ালা-মাসায়েল তথা ফিকহ সংক্রান্ত কিছু বই-পুস্তক পাওয়া গেলেও যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণ সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার বই-পুস্তক নেই বললেই চলে। অবশ্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বনামধন্য যাকাত সংস্থা ও শিক্ষাবিদ-গবেষকগণ যাকাতের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার উপর কাজ করে চলেছেন। তারা ইতোমধ্যে যাকাত সংক্রান্ত বিভিন্ন ডকুমেন্ট তৈরি করেছেন। এক্ষেত্রে ওয়ার্ল্ড যাকাত এন্ড ওয়াকফ ফোরামের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আমি ওই সংস্থার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকার সুবাদে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট নিয়ে পড়াশুনা করেছি। এমতাবস্থায়, সিজেডএম-এর অভিজ্ঞতা এবং ওয়ার্ল্ড যাকাত এন্ড ওয়াকফ ফোরামের অনুমোদিত ডকুমেন্টগুলোর সহায়তায় "যাকাত ব্যবস্থাপনা ও দারিদ্র্যবিমোচন কৌশল" শিরোনামে এ পুস্তিকা রচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া সিজেডএম শরীয়াহ বোর্ডের সদস্যদের সাথে আমার সম্পৃক্ততায় সিজেডএম কর্তৃক প্রকাশিত "যাকাতের বিধি-বিধান" বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ এতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এই বইয়ের পান্ডুলিপি শরীয়াহ্ বোর্ড সদস্যগণ দেখে দিয়েছেন।

বাংলা ভাষাভাষী যাকাতদাতা ও যাকাত সংস্থায় নিয়োজিত নীতি-নির্ধারক ও ব্যবস্থাপকবৃন্দ এ পুস্তিকা থেকে উপকৃত হবেন বলে আশা করি। মহান আল্লাহর দরবারে মুনাজাত- তিনি যেন আমার অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটিগুলো মাফ করে দেন।

মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব
০৬ মার্চ, ২০২৩

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : যাকাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য	**৯-১৬**
যাকাত ও সাদাকাহ	১০
যাকাত ও আয়কর	১১
যাকাতের ধর্মীয় তাৎপর্য	১২
যাকাতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য	১৪
দারিদ্র্যবিমোচনে যাকাত	১৬
দ্বিতীয় অধ্যায় : যাকাতের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা	**১৮-৫৯**
যাকাত ব্যবস্থাপনার ইতিহাস	১৮
যাকাত ব্যবস্থাপনার মূলনীতি	২২
আমীল (যাকাত কর্মচারী) প্রশাসন	৩৫
যাকাত ব্যবস্থাপনায় শরীয়াহ অনুসৃতি	৪২
যাকাত প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	৪৪
যাকাত ব্যবস্থাপনা পারফরমেন্স ইনডেক্স	৫৯
তৃতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশে যাকাত ব্যবস্থাপনা	**৬০-৬৮**
মুসলিম বিশ্বে যাকাত ব্যবস্থাপনা	৬০
বাংলাদেশে যাকাত ব্যবস্থাপনা	৬১
বাংলাদেশে যাকাত সংগ্রহের সুপ্ত সম্ভাবনা	৬৩
বাংলাদেশে যাকাত ব্যবস্থাপনার আইনী কাঠামো	৬৫
সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট	৬৫
সিজেডএম-এর যাকাত ব্যবস্থাপনা নীতি ও কৌশল	৬৬
সিজেডএম যাকাত বণ্টন কর্মসূচি	৬৮

চতুর্থ অধ্যায় : দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী নীতি-কৌশল **৭১-৮৫**
সম্পদ বন্টনে বৈষম্য ৭১
দারিদ্রের স্বরূপ ৭২
দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী নীতি কৌশল ৭৬
দারিদ্র্যবিমোচনে যাকাত ৮১
দারিদ্র্যবিমোচনে মহানবী (সা.)-এর কৌশল ৮২

পঞ্চম অধ্যায়: বাংলাদেশে দারিদ্র্যবিমোচন প্রচেষ্টা **৮৬-৯১**
বাংলাদেশে দারিদ্র্য পরিস্থিতি ৮৬
দারিদ্র্যবিমোচনের জন্য প্রচলিত কৌশলসমূহ ৮৭
বিকল্প মডেলের সন্ধানে ৯০

ষষ্ঠ অধ্যায় : সিজেডএম-এর দারিদ্র্যবিমোচন কৌশল ও কর্মসূচি **৯২-১০৩**
দারিদ্র্যবিমোচন কৌশল ৯২
দারিদ্র্যবিমোচন কার্যক্রম ৯৮

সপ্তম অধ্যায়: দারিদ্র্যবিমোচন কার্যক্রমের সম্ভাব্য সুফল **১০৪-১০৬**
অর্থনৈতিক উন্নয়ন ১০৪
মানব উন্নয়ন ১০৫
সামাজিক উন্নয়ন ১০৫

অষ্টম অধ্যায় : জীবিকা কর্মসূচির মূল্যায়ন **১০৭-১১৫**
সমীক্ষার ফলাফল ১০৭
আর্থিক ক্ষমতায়নে রূপান্তরকামী মডেল ১১১
উপসংহার ১১৪

পরিশিষ্ট-ক : যাকাতের বিধি-বিধান **১১৬-১২৯**
পরিশিষ্ট-খ : World Zakat Performance Index **১৩০-১৩২**

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রথম অধ্যায়

যাকাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

'যাকাত' একটি আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ : পবিত্রতা, প্রবৃদ্ধি ও প্রশংসা। পারিভাষিক অর্থে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ কোনো ব্যক্তির মালিকানায় থাকলে নির্দিষ্ট সময় পর ঐ সম্পদের একটি অংশ শরীয়াহ কর্তৃক নির্ধারিত খাতে বিতরণ ও বণ্টন করাকে 'যাকাত' বলে। এখানে 'নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ' বলতে 'নিসাব' পরিমাণ সম্পদ বুঝানো হয়েছে, যার মালিককে 'সাহিবে নিসাব' বলা হয়। 'নির্দিষ্ট সময়' বলতে এক চান্দ্র বছর এবং 'নির্ধারিত খাত' বলতে যাকাত প্রদানের খাতসমূহকে বুঝানো হয়। আবার যাকাত বলতে ঐ সম্পদকেও বুঝায় যা আল্লাহ্‌র নির্দেশের আলোকে বছরান্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের অধিকারীগণ নির্দিষ্ট খাতে বণ্টন করেন। নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ দান করাকে যেমন যাকাত বলে, তেমনি দানকৃত সম্পদকেও যাকাত বলা হয়।

যাকাতের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থের মাঝে সাযুজ্য ও সঙ্গতি বিদ্যমান। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

'তাদের (ধনীদের) সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে'।
(সূরাহ যারিয়্যাত- ৫১ : ১৯)।

যাকাত আদায়ের মাধ্যমে ধনীরা নিজেদের সম্পদে বিদ্যমান থাকা অপরের 'হক' (অধিকার) হস্তান্তর করেন। ফলে একদিকে তাদের সম্পদ পবিত্র হয়, অপরদিকে তাদের মনও কৃপণতার কলুষতা হতে পবিত্রতা লাভ করে। যাকাত আদায়ের ফলে সম্পদ আবর্তিত হয়। তাই আপাতদৃষ্টিতে সম্পদ হ্রাস পায় বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা বেড়ে যায়। তা ছাড়া যাকাতের কারণে নেকীও বর্ধিত হয়। এভাবে দেখা যায়, শব্দটির মূল আভিধানিক অর্থ তথা 'পবিত্রতা' ও 'উন্নতি' যাকাত আদায়ের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

যাকাত ও সাদাকাহ

কুরআন ও হাদিসে কখনো কখনো 'যাকাত' (সুনির্ধারিত আবশ্যকীয় দান) অর্থে 'সাদাকাহ' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

তাদের সম্পদ হতে সাদাকাহ গ্রহণ করো, যা দ্বারা তুমি
তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে।
(সূরাহ আত তাওবাহ-৯ :১০৩)

মু'আয ইবন জাবাল (রা.)-কে ইয়ামানে প্রেরণের সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন, 'তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পদে সাদাকাহ্ ফরয করেছেন, যা ধনীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হবে।' উপরের আয়াত ও হাদিসে 'সাদাকাহ' শব্দটি 'যাকাত' তথা 'অত্যাবশ্যকীয় দান'-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যাকাত ও সাদাকাহ্ সমার্থবোধক পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ধীরে ধীরে ফিকহ অভিজ্ঞানের গ্রন্থগুলোতে দু'টো পরিভাষা পৃথক হয়ে যায়; 'অত্যাবশ্যকীয় দান' যা ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ, এ অর্থে 'যাকাত' পরিভাষাটির প্রচলন নির্দিষ্ট হয়ে যায়। অপরদিকে, সর্বপ্রকারের ঐচ্ছিক দান বুঝাতে 'সাদাকাহ্' শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। যাকাত ও সাদাকাহ-এর মাঝে বিদ্যমান পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ :

ক. যাকাত শব্দের অর্থ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া ও পবিত্রতা অর্জন করা। অপরদিকে, সাদাকাহ শব্দের অর্থ সত্যবাদিতা অর্থাৎ ঈমানের সত্যতা প্রমাণে ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অর্থব্যয় করা।

খ. যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ বিধায় সামর্থ্যবান মুসলিমের ওপর যাকাত আদায় করা ফরয। কিন্তু সাদাকাহ ইসলামের স্তম্ভ নয়, সাদাকাহ দেয়া সাওয়াবের কাজ; তবে এটি ফরয নয়।

গ. শরীয়াহর দৃষ্টিতে যাকাত দিতে অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায়। কিন্তু সাদাকাহ প্রদান না করলে কোনো শাস্তির বিধান নেই।

ঘ. যাকাত অস্বীকারকারীকে পরকালীন শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। অপরদিকে, সাদাকাহ না দিলে ফযিলত ও সাওয়াব হতে বঞ্চিত হবে, তবে শাস্তি হবে না।

ঙ. যাকাতযোগ্য সম্পদের প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ধারিত। পক্ষান্তরে, যে কোনো সম্পদ হতে সাদাকাহ করা যায়, এর কোনো নিসাব নেই বা আদায়ের নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই।

চ. যাকাত প্রদানের হার সুনির্ধারিত। তবে 'ঐচ্ছিক দান' বলে সাদাকাহর সুনির্দিষ্ট কোনো হার নেই।

ছ. প্রতি চান্দ্রবছরে একবার যাকাত প্রদান করা ফরয। অপরদিকে, প্রতি বছর সাদাকাহ না দিলে কোনো অসুবিধা নেই। আবার এক বছরে একাধিকবারও সাদাকাহ দেয়া যায়।

জ. আল কুরআনে বর্ণিত সুনির্দিষ্ট খাতের বাইরে যাকাত বণ্টন করা যায় না। তবে, যে কোনো জনকল্যাণমূলক খাতে সাদাকাহ-এর অর্থ ব্যয় করা যায়।

সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে যাকাত ও সাদাকাহ-এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যাকাত তো অত্যাবশ্যকীয় দান, এর দাতা ও গ্রহীতা নির্ধারিত। মুসলিম সমাজের সদস্যরা যদি যাকাত ব্যতীত অন্য কোনো দান না করে তবে সমাজের অনেক প্রয়োজন বা জরুরি কর্তব্য সম্পাদন করা সম্ভব হবে না। তাই যাকাত প্রদানের পাশাপাশি সাদাকাহ প্রদানেও এগিয়ে আসা উচিত।

যাকাত ও আয়কর

অনেকে ভুলবশত ঃ যাকাত ও আয়কর অভিন্ন মনে করেন এবং এ ধারণার বশবর্তী হয়ে যাকাত প্রদান হতে অব্যাহতি পেতে চান। তাদের যুক্তি হলো, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদিনের আমলে রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত সংগ্রহ ও বণ্টন করা হতো। বর্তমানে সরকার সামর্থ্যবান নাগরিকের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করে। তাছাড়া দারিদ্র্যবিমোচন সরকারি কর্তব্য। তাই যারা সরকারকে কর প্রদান করে তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে যাকাত দিতে হবে না। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। যাকাত ও আয়কর এক নয়। উভয়ের মাঝে উৎস ও বিধানগত পার্থক্য রয়েছে। আয়কর প্রদান করলে কিছুতেই যাকাত হতে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না। নিম্নে যাকাত ও আয়করের পার্থক্য তুলে ধরা হলো :

ক. যাকাত ইসলামের তৃতীয় রুকন বা স্তম্ভ এবং তা মুসলিম মাত্রই পরিশোধ করা ধর্মীয় কর্তব্য। অপরদিকে, রাষ্ট্রকে কর প্রদান করা নাগরিক কর্তব্য।

খ. যাকাত বিধানের উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ্। পক্ষান্তরে, কর সংক্রান্ত আইন, বিধি-বিধানের উৎস হলো আইনসভা বা সরকারের আদেশ।

গ. যাকাতযোগ্য সম্পদের প্রকৃতি ও পরিমাণ (নিসাব) সুনির্দিষ্ট এবং চিরদিনের জন্য তা অপরিবর্তনীয়; কিন্তু করযোগ্য সম্পদের প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্দিষ্ট নয়। সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে তা নির্ধারিত হয় এবং তা পরিবর্তনশীল।

ঘ. যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ আল কুরআনে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। অপরদিকে, করের অর্থ দ্বারা সরকারের রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয় মেটানো হয়।

ঙ. যাকাত সরকারিভাবে প্রদান করা যায়, আবার ব্যক্তিগত ও বেসরকারিভাবেও বণ্টন করা যায়; কিন্তু একমাত্র দেশের সরকারই কর সংগ্রহ ও ব্যয় করে। করের অর্থ ব্যক্তিগত বা বেসরকারিভাবে ব্যয় করা যায় না।

চ. যাকাত ধর্মীয় কর্তব্য হওয়ায় এটি কেবল মুসলিমের ওপর ফরয। অপরদিকে, আয়করের বিধান সম্পদশালী সব নাগরিকের ওপর প্রযোজ্য।

ছ. যাকাত প্রদানের বিষয়ে কেউ কাউকে অব্যাহতি দিতে পারে না; কিন্তু সরকার তার নাগরিকদের কর প্রদানের ক্ষেত্রে অব্যাহতি বা হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারে।

যাকাতের ধর্মীয় তাৎপর্য

সালাত শারীরিক ইবাদাত হওয়ায় 'আল্লাহ্র হক'-এর সাথে সম্পৃক্ত। অপরদিকে, যাকাত আর্থিক ইবাদাত; এর সাথে আল্লাহ্ ও বান্দা-উভয়ের 'হক' জড়িত। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে একদিকে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা সম্ভব; অপরদিকে দারিদ্র্যের অভিশাপ হতে সমাজকে মুক্ত করাও সম্ভব।

উল্লেখ্য যে, ফরয আমলগুলোর মধ্যে সালাতের পরই যাকাতের স্থান। আল-কুরআনে অন্যূন ২৮টি স্থানে সালাতের সাথে যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে একজন মুসলিম একটি ফরয ইবাদাত আদায় করেন। সুতরাং যাকাতের ধর্মীয় তাৎপর্য অপরিসীম।

প্রথমত, যাকাত আদায়ের মাধ্যমে ব্যক্তির অন্তর কলুষমুক্ত হয়। সম্পদের লোভ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। তবে এটির নিয়ন্ত্রণেই মানুষের কল্যাণ। যাকাত মানুষের কাছে এ সুযোগ এনে দেয়। প্রতি বছর নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ দান করলে মানুষের মন লোভ-লালসা ও কৃপণতার ব্যাধি হতে মুক্তি লাভ করে। আত্মার পরিশুদ্ধির ক্ষেত্রে যাকাতের ভূমিকার কথা আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, যাকাত পাপমুক্তির সুযোগ এনে দেয়। মানুষের মাঝে সর্বদা সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তির লড়াই বহমান। প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ পাপে লিপ্ত হয়। যাকাত ও সাদাকাহ প্রদান করলে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের গুনাহ মাফ করে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> 'তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান করো, তবে তা ভালো। কিন্তু যদি দান করো গোপনে এবং তা দাও অভাবী লোকদের, তবে তা তোমাদের নিজেদের জন্যই কল্যাণকর। আর তিনি (দানের কারণে) তোমাদের কিছু পাপ মোচন করে দেবেন। তোমরা যা করো, তিনি তার খবর রাখেন'।
>
> (সূরাহ আল-বাক্বারাহ- ২: ২৭১)

তৃতীয়ত, যাকাত প্রদান করলে সম্পদ পবিত্র হয়। উল্লেখ্য যে, সম্পদ নিরঙ্কুশভাবে মানুষের অর্জন নয়। আল্লাহ্ পৃথিবীময় সম্পদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছেন। মানুষ চেষ্টা-প্রচেষ্টা বিনিয়োগ করে সম্পদ অর্জন করে। তাই বলে সম্পদকে কেবল নিজস্ব চেষ্টার ফল বলে ধরে নেয়া যায় না। আমরা লক্ষ্য করি যে, বহু মানুষ প্রাণান্তকর চেষ্টা করেও সম্পদ উপার্জন করতে সক্ষম হয় না। আবার কেউ কেউ সহজেই বিরাট সম্পদের মালিক হয়। কারণ আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করেন, আবার যাকে ইচ্ছা রিযিক সংকীর্ণ করে দেন। সম্পদশালীকে আল্লাহ্

তা'আলা যেমন সম্পদ দিয়েছেন তেমনি ওই সম্পদে গরিবের হক রেখে দিয়েছেন। আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত হক বলে এটিকে 'আল্লাহ্র হক' বলেও অভিহিত করা হয়। যাকাত আদায় না করলে ধনীর সম্পদে আল্লাহ্ ও গরিবের হক থেকে যায়। অপরের হক বিদ্যমান থাকায় সম্পদ পবিত্র হয় না। আর তাই যাকাত প্রদানের মাধ্যমে ধনীরা তাদের সম্পদে বিদ্যমান অপরের হক আদায় করতে সমর্থ হন। এভাবে তাদের সম্পদ পবিত্র হয়। সম্পদ পবিত্রকরণে যাকাতের ভূমিকার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

'আল্লাহ তো যাকাত ফরয করেছেন তোমাদের অবশিষ্ট
সম্পদকে পবিত্র করার জন্য'।

(সুনান আবু দাউদ)

চতুর্থত, যাকাত আদায় করলে সম্পদ নিরাপদ হয়। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যাকাত আদায় করলে সম্পদ পবিত্র হয়। সুতরাং পবিত্র সম্পদকে আল্লাহ্ তা'আলা বিপদাপদ ও দৈব-দুর্বিপাক হতে নিরাপদে রাখেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বর্ণনা করেছেন, 'কোনো সম্পদে যাকাত মিশ্রিত হলে তা সে সম্পদকে ধ্বংস করে দেয়।' অর্থাৎ যাকাত আদায় না করলে তা মূল সম্পদের সাথে মিশে যায়, ফলে তা সম্পদকে ধ্বংস করে দেয়। এ হাদিসের ভাবার্থের বিপরীত প্রয়োগে বলা যায়, যাকাত আদায় করলে সম্পদ নিরাপদে থাকে।

যাকাতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য

যাকাতের মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। বর্তমান পৃথিবীর অশান্তির অন্যতম কারণ হলো দারিদ্র্য। বিস্ময়কর বিষয় হলো যে, সম্পদের স্বল্পতা দারিদ্র্যের কারণ নয়; পৃথিবীতে কখনো সম্পদের স্বল্পতা ছিল না, এখনো নেই। দারিদ্র্যের মূল কারণ হলো সমাজের কিছু শ্রেণির মানুষের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়া, অবশিষ্ট জনগণের সম্পদশূন্য হওয়া। সংবাদ সংস্থা রয়টার্স-এর প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে (২০১৭ সাল) বলা হয়েছিল যে, পৃথিবীর আট শীর্ষ ধনীর হাতে রয়েছে বিশ্বের মোট সম্পদের অর্ধেক। অর্থাৎ উক্ত আট ব্যক্তির কাছে যে সম্পদ আছে তা বর্তমান পৃথিবীর অর্ধেক মানুষের সম্পদের সমান।

যাকাত কেন্দ্রীভূত সম্পদের ভাণ্ডারকে জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। যাকাত ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তির ভাণ্ডার হতে বিপুল জনগোষ্ঠীর হাতে সম্পদ আবর্তিত হয়। ফলে বৈষম্য হ্রাস পায়। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো যে, যাকাত ফরয হওয়ার জন্য খুব বেশি সম্পদের প্রয়োজন নেই। মৌলিক খরচের অতিরিক্ত সম্পদ এক চান্দ্র বছর হাতে থাকলেই যাকাত দিতে হয় (স্বর্ণ বা রূপার হিসাবে)। আবার যাকাতের পরিমাণও খুব বেশি নয়, মাত্র ২.৫% ভাগ। এভাবে যাকাত-দাতা ও গ্রহীতার মাঝে অর্থনৈতিক ব্যবধান খুব দ্রুত সংকীর্ণ হয়ে আসবে। আর তাই বলা যায়, বণ্টন বৈষম্য দূর করে যাকাত অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে, ফলে দূরীভূত হয় দারিদ্র্য। যাকাতের বিধানে ধনীদের জন্যও সুরক্ষা আছে। প্রথমত যাকাতের পরিমাণ একেবারেই কম (২.৫%), দ্বিতীয়ত সম্পদ বর্ধনশীল হওয়ার শর্ত; এর উদ্দেশ্য হলো যাকাত দিতে গিয়ে ধনী যেন আবার দরিদ্র হয়ে না পড়ে।

সমাজের ক্ষুদ্র একটি অংশের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে থাকলে উৎপাদন ব্যবস্থায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। সচ্ছলতার অভাবে সাধারণ ভোক্তারা পণ্য ক্রয় করতে পারে না। ক্রয়ক্ষমতার অভাবে চাহিদা কমে, আর চাহিদার অভাবে উৎপাদন হ্রাস পায়। তদুপরি কেবল ধনিক শ্রেণির হাতে সম্পদ থাকার কারণে বাজারের পণ্যবৈচিত্র্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ধনী ভোক্তাদের পণ্য শ্রেণি পৃথক হয়ে থাকে। ফলে সাধারণ ভোক্তাদের ওপর নির্ভর করে এমন শিল্প তথা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শ্রেণির উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যাকাতের মাধ্যমে গরিবের ক্রয়ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে, বিশেষত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা গতিপ্রাপ্ত হয়।

অর্থনীতির সূচকগুলো একটি আরেকটির ওপর নির্ভরশীল। উৎপাদনের সাথে কর্মসংস্থানের সম্পর্ক রয়েছে। দরিদ্রদের হাতে পুঁজি না থাকায় তারা কোনো বিনিয়োগ করতে পারে না। তাদেরকে যাকাত দেয়া হলে তারা তা উৎপাদনে বিনিয়োগ করতে পারে। উৎপাদনে গতি আসার কারণে কর্মসংস্থান বেড়ে যায়। আবার কর্মসংস্থান বেড়ে যাওয়ায় বেকারত্ব দূর হয়। সাধারণতঃ দেখা যায়, সামাজিক অপরাধের অন্যতম

প্রধান কারণ বেকারত্ব। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে বেকারত্ব হ্রাস করে বলে অপরাধ প্রবণতা হ্রাসের ক্ষেত্রে যাকাতেরও ভূমিকা রয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন,

'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অঢেল সম্পদ দেন, আবার কারো
রিযিক সংকীর্ণ করে দেন'।
(সূরাহ আল-বাক্বারাহ, ২ : ২৪৫)

সম্পদ ও দারিদ্র্য দু'টো দিয়েই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে পরীক্ষা করেন। তিনি দেখতে চান যে, সম্পদের মালিক হয়ে ধনীরা তাঁর প্রতি শোকরগুজার করে কিনা এবং দরিদ্রদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় কিনা। আবার দরিদ্ররা তাদের অসচ্ছল অবস্থা ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করে আল্লাহ্র অনুগ্রহপ্রাপ্তির জন্য সুন্দরভাবে প্রচেষ্টা চালায় কিনা।

অতএব, যাকাত আদায়ের মাধ্যমে ধনী ব্যক্তি তার সম্পদে স্থিত 'গরিবের হক' আদায় করেন। তাই তার মনে অহঙ্কার বা দানশীলতার গর্ব সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। অপরদিকে, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা মানুষের একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য। তাই গরিবরা স্বভাবতঃই যাকাত প্রদানকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে। এভাবে পারস্পরিক ভালোবাসা, সহানুভূতি, সম্মান প্রদর্শন ও কৃতজ্ঞতাবোধের পরিবেশ গড়ে ওঠে। ইসলাম শ্রেণিবৈষম্য ও শ্রেণিভেদের অজুহাত তুলে সমাজে বিভক্তি সৃষ্টি করতে চায় না। এর পরিবর্তে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সম্মান ও ভালোবাসার পরিবেশ তৈরি করতে চায়, যা যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে সৃষ্টি করা সম্ভব।

বস্তুত : মানব সমাজে যাকাত হচ্ছে একমাত্র টেকসই ও কার্যকর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে সম্পদশালী ব্যক্তির ২.৫% ভাগ সম্পদ বাধ্যতামূলকভাবে অভাবী ও বঞ্চিতদের কাছে মালিকানাসহ হস্তান্তরিত হয়। সুতরাং যাকাত হচ্ছে সমাজের পিছিয়ে পড়া লোকদের মৌলিক চাহিদাপূরণ ও জীবনমান উন্নয়নের একটি টেকসই ব্যবস্থা।

দ্বিতীয় অধ্যায়
যাকাতের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা

যাকাত ব্যবস্থাপনার ইতিহাস

আল কুরআনে যাকাত আদায় ও তা নির্দিষ্ট কয়েকটি খাতে বিতরণের সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তবে যাকাতের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা যে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হতে হবে আল্লাহ তা'আলা তারও ইঙ্গিত দিয়ে দিয়েছেন। যাকাত বণ্টনের আর্থিক খাতের মধ্যে তৃতীয় খাতটি হচ্ছে 'আমেলীনা আলাইহা' তথা যাকাত ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মচারীবৃন্দ। আর কর্মচারী নিয়োগের প্রাসঙ্গিকতা আসে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে। রাসূল (সা.) রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণ করতেন। ফরয ইবাদত হিসেবে যাকাত ব্যবস্থাপনা রাসূল (সা.) এবং পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদিন যেভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন মুসলিম উম্মাহর জন্য সেটাই হচ্ছে অনুসরণীয় মডেল।

রাসূল (সা.)- এর মক্কী জীবনে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল কম এবং তারা তখনও স্থিতিশীল সমাজ কাঠামো গড়ে তুলতে পারেননি। অনেকেই হিজরত করেছিলেন। রাসূল (সা.)-এর জীবনের নিরাপত্তা ছিল ভয়ানক হুমকির মুখে। তবে মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা ছিল প্রবল। এ সময় মহান আল্লাহ তাদেরকে পরস্পরের জন্য সাদাকাহ ও সাহায্য-সহায়তার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। মাদানি জীবনে মহানবী (সা.)-এর নেতৃত্বে মুসলিমরা সঙ্ঘবদ্ধ হয় এবং 'মদিনা সনদ' (Medina Charter) নামক একটি সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তোলেন। এ সময় আল্লাহ তাআলা যাকাতকে ফরয ইবাদত হিসেবে ঘোষণা দেন। রাসূল (সা.)-এর নেতৃত্বে সরকারি তথা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাকাত আদায় ও বণ্টন শুরু হয়। তিনি যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও দলকে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিনিধি (আমেলীন) পাঠাতেন।

মহান আল্লাহ রাসূল (সা.)-কে সম্পদশালী মুসলিমদের কাছ থেকে সাদাকা তথা যাকাত গ্রহণের আদেশ দেয়ার পর তাদের জন্য রহমতের দোয়া করারও নির্দেশ দেন। আল্লাহর আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সব আলেমগণ মনে করেন যে, মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান বা তাঁর প্রতিনিধির কর্তব্য হলো যাকাত আদায় ও বিতরণ করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা। রাসূল (সা.) মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.)-কে ইয়েমেনে প্রেরণ করার সময় এভাবেই নির্দেশনা দিয়েছিলেন (ইসলামের যাকাত বিধান : ইউসুফ আল কারযাভী)

যাকাত দাতা যাকাত পরিশোধ করবেন ইবাদাত হিসেবে সন্দেহ নেই এবং সেজন্য তিনি পরকালে উপযুক্ত পুরস্কার পাবেন; আর যাকাত প্রদান না করলে তিনি শাস্তি ভোগ করবেন। তবে ইসলামের বিধান হচ্ছে, যে লোক কার্পণ্য, অবহেলা, লোভ-লালসা বা পার্থিব স্বার্থে প্রলুব্ধ হয়ে যাকাত দিতে অস্বীকার করবে, ইসলামী রাষ্ট্র তার কাছ থেকে জোরপূর্বক যাকাত আদায় করবে। এরূপ কর্তৃত্ব আসবে শরীয়াহ প্রদত্ত সার্বভৌম ক্ষমতার বলে। রাষ্ট্র শক্তিই এটি প্রয়োগ করবে। এটাই রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ। রাসূল (সা.) বলেছেন :

> যে লোক সাওয়াবের আশায় যাকাত দিয়ে দিবে, সে তার সাওয়াব অবশ্যই পাবে। আর যে তা দিতে অস্বীকার করবে, আমি তা অবশ্যই আদায় করব তার ধন-সম্পদের অংশ থেকে।
> (আহমদ, নাসাঈ, আবু দাউদ)

ইসলামের সূচনাকালে যাকাত না দিলে শাস্তি দানের ব্যবস্থা চালু ছিল। প্রথম খলিফা আবু বকর (রা.) যারা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষকে যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। বস্তুতঃ যাকাত দিতে অস্বীকারকারী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা বহুসংখ্যক সহিহ হাদিস দ্বারা যেমন প্রমাণিত, তেমনি এর উপর সাহাবায়ে কিরামের ঐকমত্য (ইজমা) কায়েম হয়েছে (ইসলামের যাকাত বিধান : ইউসুফ আল কারযাভী)

সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ইতিহাসে হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে সর্বপ্রথম দরিদ্র,

মিসকিন ও সমাজের দুর্বল ব্যক্তিদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করেন। সমাজের শক্তিমান লোকেরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত এদেরকেই শোষণ করে আসছিল। কিন্তু তারা কোনো শাসকের কাছে এর প্রতিকার পায়নি। ধনী ও শক্তিমানদের কাতার ছেড়ে দুর্বলদের পক্ষে দাঁড়াতে তখন পর্যন্ত কেউ রাজি হয়নি। রাসূল (সা.)-এর সময় যাকাত দিতে অস্বীকার করার সাহস কেউ করেনি। কিন্তু আবু বকর (রা.) ও তাঁর সঙ্গী সাথীগন যাকাত দিতে অস্বীকারকারী লোকদের দ্বারা বিভ্রান্ত হননি। তিনি অকুণ্ঠচিত্তে যুদ্ধ করে দরিদ্রদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। (ইসলামের যাকাত বিধান : ইউসুফ আল কারযাভী)

খোলাফায়ে রাশেদিন এবং পরবর্তী মুসলিম শাসকগণ দীর্ঘকাল পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যাকাত আদায় ও বিতরণ করতেন এবং তখন যাকাত বায়তুলমাল তথা রাষ্ট্রীয় রাজস্বের একটি শক্তিশালী উৎস হিসেবে কাজ করত। সময়ের পরিক্রমায় ইসলামী খেলাফত ও শাসন ব্যবস্থার মূল চরিত্র ভেঙ্গে পড়ায় এবং আরো পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী ঔপনিবেশিক শক্তির করাল গ্রাসে পতিত হওয়ায় যাকাত ও ওয়াকফ ব্যবস্থা বিকৃত হতে শুরু করে।

প্রশ্ন হচ্ছে কোনো মুসলিম রাষ্ট্র বা সরকার যদি যাকাত আদায় না করে তাহলে যাকাত দাতা কী করবেন? এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও সরকার বা সমাজ সংস্থা যদি তা আদায় করার কোনো কার্যকর পদক্ষেপ না নেয় তা হলেও মুসলিম ব্যক্তি এ ফরজ আদায় করা থেকে অব্যাহতি পাবে না। শরীয়াহর বিধান অনুযায়ী তাকে যাকাত পরিশোধ করতেই হবে। (ইসলামের যাকাত বিধান : ইউসুফ আল কারযাভী)

দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা.) প্রথম খলিফার যাকাত ব্যবস্থাপনা নীতি বহাল রাখেন। তাঁর আমলে সার্বিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা অধিকতর সুবিন্যস্ত ও সুন্দর হয়। এর ফলে যাকাত আদায় বিতরণ এবং বায়তুলমাল সম্প্রসারিত হয়ে আরো শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। তৃতীয় খলিফা উসমান (রা.) যাকাত ব্যবস্থাপনায় কিছুটা সংস্কার সাধন করেন। তখন ইসলামী সাম্রাজ্য দূর-দূরান্তে বিস্তৃত হওয়ায় এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা কঠিন হওয়ায় উসমান (রা.) অপ্রকাশিত সম্পদের (যেমন অলংকার, স্বর্ণ-রৌপ্য ইত্যাদি) যাকাত ব্যক্তিগতভাবে বিতরণ

করার নির্দেশনা দেন। এ ব্যবস্থা আজও সৌদি আরবে বহাল রয়েছে। তবে প্রকাশিত সম্পদ (যেমন: কৃষি ফসল, গবাদি পশু) থেকে সরকারিভাবে যাকাত আদায় করা হতো। চতুর্থ খলিফা আলী (রা.) যাকাত ব্যবস্থায় বিশেষ কোনো সংস্কার করেননি। তিনি মূলতঃ তাঁর খিলাফতের সময়কালে বিভিন্ন বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন।

খোলাফায়ে রাশেদিনের পর ইসলামী খিলাফতের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃত্ব চলে যায় বিতর্কিত লোকদের হাতে। মুসলিম নাগরিকদের একাংশ এসব শাসকদের হাতে যাকাত ন্যস্ত করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রা.) (দ্বিতীয় ওমর)-এর খিলাফতকালে যাকাত ব্যবস্থাপনা সমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এ সময় মুসলিম উম্মাহর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এতটা উন্নতি সাধিত হয় যে, যাকাত গ্রহীতা (মুস্তাহিক) খুঁজে বের করা কঠিন হয়ে পড়ে। পরবর্তী মুসলিম শাসকদের আমলে বৈধতার সংকট, নৈতিক পদস্খলন, বিলাসিতা, গৃহবিবাদ ইত্যাদি কারণে যাকাত আদায় রাষ্ট্রীয় তহবিলের অন্যতম উৎস হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে যাকাত বিতরণে নৈতিকতার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

পরবর্তী কয়েক শতাব্দী যাবৎ উসমানীয়, মোগল, সেলজুক বা ফাতেমী প্রভৃতি ডাইনেস্টি মুসলিম বিশ্বে শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং তারা ইসলামী খিলাফতের মডেল বজায় রাখতে না পারলেও যাকাত ও ওয়াকফ তথা ইসলামী চ্যারিটি প্রতিষ্ঠানকে বহাল রাখেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, উসমানীয় খিলাফতের রাজস্বের প্রায় তৃতীয়াংশ ছিল যাকাত ও ওয়াকফ।

এরপর ইউরোপের উপনিবেশিক শক্তিগুলো পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে জোরপূর্বক উপনিবেশ স্থাপন করে ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিশেষ করে যাকাত ও ওয়াকফকে অকার্যকর করার কৌশল গ্রহণ করে। এতো চড়াই-উৎরাইয়ের পরও সৌদি আরব, ইয়েমেন, লিবিয়া, সুদান প্রভৃতি এলাকায় যাকাত ব্যবস্থা চ্যালেঞ্জের মধ্যেও হারিয়ে যায়নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উপনিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে বেশ কিছু স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। তবে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের সরকারগুলো ছিল পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার অনুরাগী সেক্যুলার গোষ্ঠী। তারা নিজ নিজ দেশের ইসলামী আইন-কানুন পুনরুজ্জীবনের তেমন কোনো উদ্যোগ নেননি। সুতরাং যাকাত অর্থ ব্যবস্থাও ছিল তাদের কাছে অবহেলিত।

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ ষাটের দশকে এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন দেশে ইসলামী পুনরুজ্জীবনের নানাবিধ প্রয়াস দেখা যায়। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন দেশে যাকাত ও ওয়াকফের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হতে থাকে। বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থা যাকাত ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিতে শুরু করে। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের পাশাপাশি ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুদান, পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, তুরস্কসহ অনেক দেশে যাকাত সংস্থা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিকশিত হতে থাকে। একবিংশ শতকের শুরুতে যাকাত আন্দোলন গতি লাভ করে এবং বিগত ২০০৮ সালে World Zakat Forum গঠিত হয়। বর্তমানে (২০২২ খ্রিঃ) ৪১টি দেশের যাকাত সংস্থা এর সদস্যপদ লাভ করেছে।

যাকাত ব্যবস্থাপনার মূলনীতি

World Zakat Forum কার্যকর যাকাত ব্যবস্থাপনা সংস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে Zakat Core Principles (ZCP) শীর্ষক একটি খসড়া দলিল প্রণয়ন করে এবং তা ২০১৬ সালে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের মানবাধিকার শীর্ষ সম্মেলনে প্রকাশ করা হয়। এ দলিলে নিয়ন্ত্রণমূলক ছয়টি দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে : যেমন- (১) আইনগত ভিত্তি; (২) যাকাত তত্ত্বাবধান; (৩) যাকাত ব্যবস্থাপনা; (৪) অভ্যন্তরীণ কার্যাবলি; (৫) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও (৬) শরীয়াহ প্রতিপালন।

এ বিশ্ব সংস্থাটি যাকাত ব্যবস্থাপনা সংস্থাগুলোর জন্য যেসব মৌলিক নীতি (Core Principle) নির্ধারণ করেছে সেগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১. *আইনগত ভিত্তি*

যাকাত ব্যবস্থাপনা তথা যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণের দায়িত্ব সম্পন্ন সংস্থা হচ্ছে রাষ্ট্র ও সরকার। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

"আমি তাদেরকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সক্ষমতা দিলে তারা সালাত ও যাকাত কায়েম করবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজে বাধা দেবে; সব কাজের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারে।

সূরাহ হজ্জ (২২ :৪১)

মহানবী (সা:) মদিনায় রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার পর আল্লাহ নির্দেশ দেন যে,

'তাদের সম্পদ থেকে সাদাকাহ (যাকাত) গ্রহণ করবে; এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে ও পরিশুদ্ধ করবে।

সূরাহ তাওবা (৯ :১০৩)।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূল (সা:) যাকাত ব্যবস্থাপনার জন্য সাহাবীদের দায়িত্ব দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করতেন। উদাহরণস্বরূপ— তিনি মুয়ায ইবনে জাবালকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে ইয়েমেনে প্রেরণের সময় তাকে নির্দেশনা দেন যে, তুমি সেখানকার ধনীদের কাছ থেকে যাকাত সংগ্রহ করে তাদের মধ্যকার দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করবে। প্রথম খলিফা আবু বকর (রা.) যাকাত সংগ্রহের জন্য তার প্রতিনিধি প্রেরণ করতেন। কোনো কোনো এলাকায় ধনাঢ্য লোকেরা যাকাত দিতে অস্বীকার করলে আবু বকর (রা.) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সুতরাং এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, যাকাত মূলত : রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব ও কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব; তবে রাষ্ট্র বা সরকার এ মহৎ কাজটি সম্পাদনের জন্য ক্ষমতা প্রত্যর্পণ (delegation of power) করে প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারে।

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সংবিধান এবং নানাবিধ আইন-কানুন প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। মুসলিম দেশের সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আইন-কানুন ও বিধি-বিধান প্রণয়ন করে তা প্রয়োগ করা। বর্তমানকালে কোনো কোনো মুসলিম দেশে বাধ্যতামূলকভাবে যাকাত

সংগ্রহ ও বিতরণের আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। যেমন- পাকিস্তান, সুদান। আবার কোনো কোনো দেশে যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণের দায়িত্ব বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাকে প্রদান করা হয়েছে। যেমন— মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া। এসব দেশে সরকারি যাকাত সংস্থাগুলোকে নির্দিষ্ট বিধি-বিধানের আওতায় যাকাত ব্যবস্থাপনার লাইসেন্স বা অনুমতি প্রদান করা হয়। ডক্টর ইউসুফ আল কারযাভী বলেন, "যাকাত ব্যবস্থা ইসলামে ব্যক্তির উপর অর্পিত কাজ নয়; বরং সেটা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্র এর যাবতীয় ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করবে"। সুতরাং যাকাত ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত যে কোনো সংস্থাকে অবশ্যই রাষ্ট্রীয় আইন কানুনের আওতায় অনুমোদন বা লাইসেন্স নিতে হবে।

২. *যাকাত প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত কার্যাবলি*

সরকারি কর্তৃপক্ষ যাকাত ব্যবস্থাপনার জন্য যখন কোনো সংস্থাকে যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের অনুমোদন দিবে তখন তা অবশ্যই বিধি-বিধানের আলোকে বিশেষত নীতিমালার আওতায় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। সংস্থার কর্মপরিধি নির্ধারণ করে দিতে হবে। নচেৎ সংস্থাটি তার এখতিয়ারের বাইরে কোনো কাজে জড়িয়ে পড়তে পারে।

৩. *লাইসেন্স প্রদানের শর্ত*

একটি দেশে কোনো যাকাত ব্যবস্থাপনা সংস্থাকে লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে অবশ্যই কতকগুলো বৈশিষ্ট্য ও শর্ত নির্ধারণ করা প্রয়োজন। যেমন- সংস্থার আইনগত বৈধতা, তার কর্মপরিধি, তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা, আমীল বা যাকাত কর্মচারী নিয়োগ, শরী'য়াহ সম্পর্কিত জ্ঞান, শরী'য়াহর বিধি-বিধানের নিশ্চয়তা, ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা, হিসাবরক্ষণের দক্ষতা, স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা ইত্যাদি অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে। এরপরে আবেদনকারী সংস্থাগুলোর সাংগঠনিক কাঠামো, কার্যক্রম ও সক্ষমতা পরীক্ষা করাও জরুরি। এসব কিছুই লাইসেন্স প্রদানের শর্ত বলে গণ্য হতে পারে।

৪. *যাকাত ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান*

যাকাত সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত কর্মচারীদের বহুপ্রকার দায়িত্ব ও বিভিন্ন রকমের কাজ রয়েছে যার সবই যাকাত সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট।

কোন ব্যক্তির ওপর এবং কোন মাল-সম্পদের উপর যাকাত ধার্য হবে, যাকাতের পরিমাণ কত হবে, যাকাত কে কে পেতে পারে, তাদের সংখ্যা কত, তাদের প্রয়োজন কী পরিমাণ, কত পেলে তাদের জন্য যথেষ্ট হয় ও প্রয়োজন মেটে, এসব নির্ধারণ করা তাদের প্রধান কাজ। (ইউসুফ আল কারযাভী)

যাকাত কর্মচারীদের উপর অর্পিত এসব কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করা হচ্ছে কি না বা কোন প্রক্রিয়ায় করা হচ্ছে তা মনিটরিং তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনার জন্য তত্ত্বাবধানকারী কর্তৃপক্ষ থাকতে হবে। সাধারণত গভর্নিং বোর্ড বা পরিচালনা পর্ষদ এ কাজটি সম্পাদন করতে পারে। অনুমোদন কর্তৃপক্ষ সংস্থার যে মেমোরেন্ডাম অনুমোদন দেয় তাতে গভর্নিং বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যাবলি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

৫. ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধানের কলাকৌশল

যাকাত সংগ্রহের প্রথম পদক্ষেপ হলো আমীল (যাকাত কর্মচারী) নিয়োগ করা। কোন গুণাবলি ও যোগ্যতাসম্পন্ন জনবল নিয়োগ করা হবে তার বিধি-বিধান ও তাদের বেতন কাঠামো নির্ধারণ; যাকাতদাতা (মুযাক্কী) তালিকা প্রণয়ন (সরকারিভাবে বাধ্যতামূলক হলে সকলের তালিকা); যাকাত নির্ণয়ের মাসায়লা অনুসরণ ও যাকাত দাতাদেরকে তা অবহিতকরণ; যাকাত সম্পদ সংগ্রহের পর তার হিসাব সংরক্ষণ; যাকাত বণ্টনের জন্য যাকাতের হকদার (মুস্তাহিক) চিহ্নিতকরণ; এবং সেক্ষেত্রে শরীয়াহর বিধান অনুসরণ; কাকে কী পরিমাণ দিতে হবে তা নিরূপণ; বিতরণে স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিতকরন ইত্যাদি সার্বিক কার্যক্রম যাতে সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে নিষ্পন্ন হয় সেজন্য সুচিন্তিত পদ্ধতি (methodology) উদ্ভাবন করতে হবে। বিশেষ করে আধুনিক যুগে ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য বিভিন্ন প্রকার কলাকৌশল ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে, সেগুলোকে যাকাত ব্যবস্থাপনার সাথে সামঞ্জস্যবিধান (customize) করে ব্যবহার করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ— যাকাতভিত্তিক দারিদ্র্যবিমোচন প্রকল্প প্রণয়ন, বাজেট তৈরি, হিসাব সংরক্ষণ বা প্রকল্প মনিটরিংয়ের জন্য আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়। যাকাত ব্যবস্থাপনায় সব কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য আধুনিক নিরীক্ষা (auditing) পদ্ধতি কাজে লাগানো যায়। গভর্নিং

বোর্ডের পক্ষ থেকে সব বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করা উচিত যাতে যাকাত কর্মচারীরা তা অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। রাষ্ট্রীয় কোনো সংস্থা যাকাত ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোর কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও বিধি-বিধান তৈরি করতে পারে। অপরদিকে, যাকাত ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য যাকাত সংস্থার একটি সাংগঠনিক কাঠামো থাকতে হবে। এটি এমনভাবে বিন্যস্ত হবে যাতে সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত একটি 'চেইন অব কমান্ড' বজায় থাকে। যাকাত সংস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ সৃষ্টি, তাদের কার্যাবলি নির্ধারণ, সেগুলোর সামঞ্জস্য বিধান, প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্য বন্টন, তত্ত্বাবধান পরিসর নির্ধারণ এবং প্রয়োজনীয় উপকরণের সমন্বয় সাধন করতে হবে। সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে- (ক) চেয়ারম্যান; (খ) পরিচালনা পরিষদ বা বোর্ড অব গভর্নরস; (সা.) নির্বাহী কমিটি; (ঘ) অডিট কমিটি; (ঙ) শরীয়াহ সুপারভাইজরি বোর্ড; (চ) নির্বাহী প্রধান বা ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নেতৃত্বে যাকাত কর্মীবাহিনী ইত্যাদি। যাকাত সংস্থার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও বাজেটের পাশাপাশি মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা উচিত যাতে তারা সুবিন্যস্তভাবে তার লক্ষ্য হাসিল করতে পারে। মাঝে-মধ্যে পরিকল্পনাগুলো পর্যালোচনা করে দেখা উচিত যে সেগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা।

৬. *যাকাত ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধান সম্পর্কিত প্রতিবেদন*

যাকাত সংস্থা যেসব কার্য সম্পাদন করবে তথা কত পরিমাণ যাকাত তহবিল সংগৃহীত হয়েছে, তা কোন কোন খাতে কী পরিমাণে ব্যয় হয়েছে এবং সার্বিক কর্মকাণ্ড শরীয়তসম্মতভাবে হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে নিয়মিতভাবে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে। এ প্রতিবেদন একদিকে রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জন্য যেমন প্রয়োজন, তেমনি সংস্থার তত্ত্বাবধায়ক অর্থাৎ গভর্নিং বোর্ডের জন্যও প্রয়োজন। বিশেষ করে যাকাত সংস্থাগুলো হোক তা সরকারি বা বেসরকারি তাদের কার্যক্রমের স্বচ্ছতার মাধ্যমে যাকাতদাতা ও যাকাত গ্রহীতাদের আস্থা অর্জনের জন্য রিপোর্ট প্রকাশ করা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

৭. *যাকাত সংস্থার ভুল-ত্রুটি সংশোধনের ব্যবস্থা*

যাকাত ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সংস্থাগুলো বিভিন্ন শর্ত সাপেক্ষে সরকারি অনুমোদন নেয়ার পর তার কর্মকান্ডের কোনো ব্যত্যয় ঘটলে তা সংশোধনের জন্য লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ তা সংশোধনের জন্য হস্তক্ষেপ করতে পারবে। এমনকি বিধি বিধান লংঘনের ক্ষেত্রে গুরুতর অন্যায় করলে সংশ্লিষ্ট সংস্থার লাইসেন্স বাতিলের ক্ষমতা থাকবে। এভাবেই যাকাত সংস্থাগুলোর কর্মকান্ড বিধিসম্মতভাবে নিয়ন্ত্রণ (regulate) করা যেতে পারে।

৮. যাকাত কর্মচারী ব্যবস্থাপনা

আগেই বলা হয়েছে যে, পবিত্র কুরআনে সূরাহ তাওবার ৬০ নং আয়াতে যাকাত বন্টনের যে ৮টি আর্থিক খাত উল্লেখ করা হয়েছে তার তৃতীয়টি হচ্ছে যাকাত কর্মচারী (আমেলীনা আলাইহা)। যাকাত সংগ্রহ ও বণ্টনের কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য অবশ্যই কর্মচারী বা জনবল নিয়োগের বিষয়টি অনিবার্যভাবেই এসে যায়। বিষয়টির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে মহান আল্লাহ তাদের পারিশ্রমিক যাকাত থেকে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। মূলত ঃ যাকাত ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট জনবল হচ্ছে প্রধান নিয়ামক শক্তি। সুতরাং তাদের ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের বিষয়টিও বেশ প্রাসঙ্গিক। প্রথমত, যাকাত কর্মচারী (আমেলীন) কাকে বলা হবে; দ্বিতীয়ত, আমেলীন নিয়োগের যোগ্যতা ও গুণাবলি কী কী থাকতে হবে; এবং তৃতীয়তঃ আমিলিন নিয়োগ করার কর্তৃপক্ষ কে হবে ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

যাকাতের জনবল ব্যবস্থাপনা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা কর্মী সংগ্রহ, নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, মূল্যায়ন, বেতন ও ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং তাদের মধ্যকার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট। যাকাত সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিধি মোতাবেক একদল সৎ, চৌকষ, মেধাবি, একনিষ্ঠ, কর্মঠ ও তাকওয়াবান জনবল নিয়োগ করতে হবে এবং তাদের যাবতীয় ব্যয়ভার যাকাত তহবিল থেকে বহন করা হবে। এদেরকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে

আধুনিক ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানের পাশাপাশি কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে হবে। তাদের যোগ্যতা, সামগ্রিক দক্ষতা, উদ্ভাবনী ক্ষমতা, দায়িত্বের প্রতি একনিষ্ঠতা ইত্যাদি পর্যালোচনা করে মূল্যায়ন করতে হবে।

ইউসুফ আল কারযাভী যাকাত কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্তের উল্লেখ করেছেন তার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে নিম্নরূপ :

ক. যাকাত কর্মচারীকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। ইবনে কুদামাহ বলেছেন যে, 'যেহেতু এ কাজের জন্য আমানতদারীতা ও পরম বিশ্বস্ততা থাকা জরুরী শর্ত বিশেষ; সেহেতু কর্মচারীও মুসলিম হওয়া জরুরী; (কারযাভী ৬৫)। উমর (রা) : বলেছেন, এ লোকদের (অমুসলিমদের) তোমরা আমানতদার বানিও না; কারণ তারা নিজেরাই আল্লাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

খ. যাকাত কর্মচারীকে পূর্ণবয়স্ক (বালেগ) ও সুস্থ বিবেকবোধ সম্পন্ন হতে হবে।

গ. যাকাত কর্মচারীকে বিশ্বস্ত ও আমানতদার হতে হবে।

ঘ. যাকাত কর্মচারীকে যাকাতের বিধি-বিধান সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে।

ঙ. যাকাত কর্মচারীকে কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকতে হবে।

চ. যাকাত কর্মচারী পুরুষ হওয়া ভালো। তবে মহিলাদের নিয়োগ করা নিষিদ্ধ হওয়ার পক্ষে বিশেষ কোনো দলিল নেই। এ ক্ষেত্রে সাধারণ নীতিমালা হচ্ছে, মহিলাদেরকে পুরুষদের ভিড় ও অবাধ মেলামেশার স্থান ও কেন্দ্র থেকে দূরে সরে থাকতে হবে। বিনা প্রয়োজনে এসব ক্ষেত্রে মহিলাদের যাওয়া অনুচিত। তবে সীমিত পরিবেষ্টনীতে মহিলাদের এ কাজে লাগানো যেতে পারে। যেমন- তারা দরিদ্র মহিলাদের কাছে যাকাতের মাল ও সেবা পৌঁছে দেয়ার কাজটা করতে পারে। অন্ততপক্ষে এ কাজে মহিলারা যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারবে বলে আশা করা যায়। সমানুপাতে তারাও মজুরি

> পাবে। শরীয়তে এ ধরনের সুযোগ না দেয়ার মত কোনো সংকীর্ণতা নেই। (ইউসুফ আল কারযাভী)

যাকাত কর্মচারী নিয়োগের এখতিয়ার কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা সংস্থার নেই। কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ বা তার অনুমোদিত সংস্থাই কেবল যাকাত কর্মচারী নিয়োগ করতে পারে এবং যাকাত তহবিল থেকে তাদের বেতন ও পারিশ্রমিক দিতে পারে।

৯. যাকাত সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা

যাকাত সংগ্রহের বিষয়টির ধরন কী হবে তা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট দেশে বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধানের উপর। যে দেশে সরকারিভাবে বাধ্যতামূলক যাকাত ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে সরকারি উদ্যোগে যাকাতদাতাদের (মুজাক্কি) ডাটাবেজ প্রণয়ন করা হয় এবং সে অনুযায়ী যাকাত সংগ্রহের প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা হয়। অপরদিকে, যে দেশে আইন অনুযায়ী যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক নয়; বরং স্বেচ্ছামূলক সেখানে সম্ভাব্য মুজাক্কির ডাটাবেজ বা পরিসংখ্যান তৈরি খুব একটা প্রাসঙ্গিক নয়। তবে যাকাতযোগ্য ও যাকাতের সম্ভাবনা নিরূপণের উদ্দেশ্যে সমীক্ষা পরিচালনা করা যেতে পারে।

বেসরকারি কোনো যাকাত সংস্থা সরকারি অনুমোদন ব্যতীত বাধ্যতামূলকভাবে যাকাত সংগ্রহ করতে পারে না। স্বেচ্ছাসেবী যাকাত সংস্থাগুলো তাদের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাকাত আদায়ের জন্য আহ্বান জানাতে পারে। বাংলাদেশ সরকারি যাকাত তহবিলে যাকাত প্রদানের জন্য কর প্রণোদনা দেয়া হয়ে থাকে; তবে যেখানে যাকাত দেয়া বাধ্যতামূলক নয়। বেসরকারি পর্যায়ে সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম) তাদের যাকাতভিত্তিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য যাকাত দাতাদের প্রতি আহ্বান জানায়। এতে ব্যক্তি ছাড়াও কর্পোরেট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও অংশগ্রহণ করে থাকে।

বেসরকারি যাকাত সংস্থাগুলো সীমিত পর্যায়ে সম্ভাব্য যাকাতদাতাদের একটি ডাটাবেজ তৈরি করতে পারে এবং তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে পারে। আমীলরা যাকাত দাতাদের যাকাতের হিসাব নিরূপণ ও মাসয়ালা তথা বিধি-বিধান সম্পর্কে পরামর্শক সেবা দিতে পারে। অপরদিকে,

তাদেরকে যাকাত সংগ্রহের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব সংরক্ষণ ও আমানতদারিতা রক্ষা করতে হবে।

১০. যাকাত বিলিবণ্টন ব্যবস্থাপনা

যাকাত সংস্থা কর্তৃক যাকাত বণ্টনের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ড. ইউসুফ আল কারযাভীর নিম্নোক্ত মতামত প্রণিধানযোগ্য :

'যাকাত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সামাজিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান (socio-economic security) এর মত। বর্তমানকালের পরিভাষায় বলা যায়, যাকাত পাওয়ার যোগ্য লোকদের চিহ্নিতকরণের জন্য নির্ভুল ও উত্তম পন্থা উদ্ভাবন এ সংস্থার অন্যতম দায়িত্ব। এদের সংখ্যা নিরূপণ, যাকাত পাওয়ার অধিকারের গুরুত্ব ও তাগিদ অনুভব করা, তাদের প্রয়োজনের পরিমাণ নির্ধারণ (need assessment), কত পরিমাণ দিলে কার জন্য যথেষ্ট হতে পারে, তার সব প্রয়োজন যথাযথভাবে পূরণের ব্যবস্থা হতে পারবে কি না তা জানতে হবে। এজন্য একটা সঠিক উপাত্ত (database) গড়ে তুলতে হবে যা তাদের সংখ্যা ও সামাজিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে'। (ইউসুফ আল কারযাভী)।

ইমাম নববী বলেছেন, 'রাষ্ট্রপ্রধান, যাকাত সংগ্রহকারী এবং যাকাত বণ্টনের দায়িত্বশীলদের কর্তব্য হচ্ছে যাকাত পাওয়ার যোগ্য লোকদের তালিকা সংরক্ষণ, তাদের সংখ্যাটা জানা এবং তাদের প্রয়োজনের পরিমাণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাতে সংগৃহীত সব যাকাত সুষ্ঠুভাবে বন্টন করে স্বস্তি লাভ করা যায় এবং তাদের নিকট পড়ে থেকে যাকাত সম্পদ যেন বিনষ্ট বা ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়। (ইউসুফ আল কারযাভী)

কারযাভী সংগৃহীত যাকাত তহবিল কোন খাতে কী পরিমাণে বিতরণ করা হবে সেজন্য একটি পূর্ণাঙ্গ বাজেট তৈরির আবশ্যকতার কথা বলেছেন। তার মতে, যাকাত সংস্থার একটি পরিসংখ্যান বিভাগ থাকা উচিত। যাকাত প্রাপকরা যাতে সঠিকভাবে চিহ্নিত হয় সে জন্য বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে। সার্বিক বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য কর্তৃপক্ষ চাইলে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা যেতে পারে। উপদেষ্টা পরিষদ গভর্নিং বোর্ডেও কার্যক্রম পর্যালোচনা করতে পারে।

১১. *যাকাত বিতরণে স্থান-কালের অগ্রাধিকার*

সমকালীন প্রেক্ষাপটে আমরা দেখতে পাই যে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কতিপয় জনগোষ্ঠী নিপীড়িত, ক্ষুধার্ত এবং দুর্ভিক্ষাবস্থার মধ্যে মানবেতর জীবনযাপন করছে। সোমালিয়া, ইয়েমেন, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও মায়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিমরা বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করছে। ফুকারা ও মাসাকিন হিসেবে এরাই অগ্রাধিকারভিত্তিতে যাকাত তহবিল থেকে সাহায্য-সহায়তা পাওয়ার অধিকারী। কিন্তু এসব দেশের মুষ্টিমেয় যাকাতদাতার প্রদেয় যাকাত সার্বিক চাহিদার তুলনায় খুবই নগণ্য। সেক্ষেত্রে, শরী'য়াহ ও বিবেকের যুক্তি হচ্ছে, কাতার, কুয়েত, বা আরব-আমিরাতের মতো ধনাঢ্য দেশগুলো থেকে যাকাত সম্পদ ওই দেশে প্রেরণ করা। কিন্তু বিভিন্ন দেশের আইন-কানুন ও নীতি কৌশলের বেড়াজালে আটকে থাকায় দরিদ্র দেশগুলোর মুসলিম ভাইয়েরা যাকাত প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এমনকি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে 'সুপার পাওয়ার' বলে কথিত দেশগুলোর আধিপত্যের কারণে ইসলামী চ্যারিটি ফান্ড কখনো কখনো সহজ উপায়ে প্রত্যাশিত স্থানে পৌঁছানো সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রে মুসলিম দেশগুলোর ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ ফলপ্রসূ হতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ঐক্যের অভাব রয়েছে। বিভিন্ন দেশের আইনের গণ্ডির মধ্যে থেকে কীভাবে সবচেয়ে বঞ্চিত মানবসন্তানদের জন্য যাকাত প্রেরণ করা যায়, সে ব্যাপারে যাকাত সংস্থাগুলোর নীতি-কৌশল থাকা প্রয়োজন। এছাড়া, কোনো কোনো মুসলিম দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ যাকাতের মত ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা বিকাশের জন্য অনুকূল নয়। কোনো কোনো অমুসলিম দেশের বেলায়ও এরূপ ঘটতে পারে। সেক্ষেত্রে যাকাত সংস্থাকে পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনায় 'হিকমত' অবলম্বন করে আল্লাহর সাহায্য চাইতে হবে।

১২. *যাকাত সংস্থার সুনাম সুরক্ষা*

যাকাত ব্যবস্থাপনা সংস্থা যদি যাকাত সংগ্রহ ও বণ্টনের কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে না পারে, তাহলে সেক্ষেত্রে তার সুনাম-সুখ্যাতির উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। অপরদিকে, একই কারণে যাকাতদাতারা নিরুৎসাহিত হয়ে উক্ত সংস্থায় যাকাত দেয়া বন্ধ করতে পারে। যাতে এরূপ দু'ধরনের ঝুঁকির সম্মুখীন হতে না হয় সেজন্যে যাকাত সংস্থার পরিচালক ও কর্মীদের সতর্কতার সাথে দায়িত্ব সম্পাদন করতে হবে।

১৩. যাকাত বিতরণে তহবিলের ভারসাম্যবিধান

যাকাত সংস্থাগুলোকে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে কোনো যাকাত বিতরণ কর্মসূচি বা প্রকল্প মুখ থুবড়ে না পড়ে। বস্তুতঃ কোনো কর্মসূচি গ্রহণের আগে নিশ্চিত হতে হবে যে, সেটি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ তহবিলের সংস্থান করা সম্ভব হবে কি না। আবার, যাকাত প্রাপক (মুস্তাহিক) নির্বাচনেও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত না হয়। যাকাত তহবিল যাতে কর্মসূচি মোতাবেক যথাযথভাবে সঠিক সময়ে যাকাত প্রাপকদের হাতে পৌঁছায়, সেদিকেও নজর দিতে হবে।

১৪. কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা

যে কোনো গতিশীল সংস্থার কার্যক্রম বাস্তবায়নে Standard Operating Procedure (SOP) থাকে। যাকাত সংস্থাগুলোর সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একইভাবে নির্দেশনামূলক নীতি-কৌশল ও ম্যানুয়াল থাকা প্রয়োজন। প্রতিটি কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য তার উদ্দেশ্য, ইনপুট, আউটপুট ও আউটকাম সুনির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকা উচিত এবং সেগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব তত্ত্বাবধায়কদের। বাস্তবায়ন নীতিমালা সঠিকভাবে অনুসরণ করা না হলে কার্যক্রম ব্যর্থ হতে পারে। সুতরাং, প্রতিটি সংস্থাকে এরূপ ঝুঁকি এড়ানোর জন্য নীতি-কৌশল ও সিস্টেম থাকতে হবে।

১৫. শরীয়াহ প্রতিপালন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা

যাকাত সংস্থা যেহেতু যাকাতের মতো একটি ফরয ইবাদত নিয়ে কাজ করবে, সেহেতু সার্বিক কাজটি পুরোপুরি শরীয়াহসম্মতভাবে হতে হবে। সংস্থাটি বিভিন্ন প্রকার কাজ করতে গিয়ে মাঝে মধ্যেই শরীয়াহ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও মতামত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে। পাশাপাশি তার সামগ্রিক কর্মকাণ্ড ও কর্মপরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আগে ভাগেই শরীয়াহ বিশেষজ্ঞদের মতামত নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে সংস্থার নিজস্ব উদ্যোগে একটি শরীয়াহ সুপারভাইজরি

বোর্ড গঠন করতে হবে। শরীয়াহ সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্নে উক্ত বোর্ডের মতামত চূড়ান্ত বলে গণ্য করতে হবে। উক্ত বোর্ডের আরো দায়িত্ব হচ্ছে, যাকাত সংস্থার সার্বিক কার্যক্রমের উপর নজর রাখা যাতে সেখানে কোনোভাবেই শরীয়াহ প্রতিপালনে গাফেলতি দেখা না দেয়। শরীয়াহ বোর্ডের সদস্যরা হবেন স্বাধীন ব্যক্তি ও শরীয়াহ বিশেষজ্ঞ। কোনো পক্ষ দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তারা স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করবেন। অপরদিকে, শরীয়াহ বোর্ড শুধু সভায় মিলিত হয়ে মতামত ব্যক্ত করবেন বা পরামর্শ দিবেন তা যথেষ্ট নয়; বরং তারা শরীয়াহ অডিট তথা নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। এ জন্য সংস্থা শরীয়াহ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে শরীয়াহ অডিটর নিয়োগ করতে হবে। এ ছাড়া সংস্থার স্বতন্ত্র অডিট কমিটির নিয়ন্ত্রণে অভ্যন্তরীণ হিসাব ও পারফর্মেন্স নিরীক্ষার নিয়মিত ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১৬. আর্থিক প্রতিবেদন ও বহিঃনিরীক্ষা

যে কোনো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করা একটি মৌলিক কাজ। আধুনিক যুগে ডিজিটাল পদ্ধতিতে হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের কাজটি সহজতর ও স্বচ্ছতার সাথে সম্পাদন করা যায়। হিসাব সংরক্ষণের পাশাপাশি গভর্নিং বোর্ড বা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক নিয়মিতভাবে (ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক বা বার্ষিক) আর্থিক বিবরণী ও প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে এবং তা যথাযথ ফোরামে পেশ করতে হবে। তবে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় নীতিমালা অনুযায়ী সার্টিফাইড বহিঃনিরীক্ষক (external auditor) দ্বারা সংস্থার বার্ষিক আয়-ব্যয় ও সম্পদের ব্যালেন্স শিট তৈরি করতে হবে এবং প্রচলিত পদ্ধতিতে তা সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভায় (Annual General Meeting) পেশ করতে হবে।

১৭. সংস্থার কার্যক্রম প্রকাশ ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ

যাকাত সংস্থার আর্থিক বিবরণী ও সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে যাতে সকলে সংস্থার কার্যক্রম স্বচ্ছতার সাথে অবহিত হতে পারে। আধুনিক যুগে সংস্থার ওয়েব পেইজে উক্ত প্রতিবেদন আপলোড

করা যেতে পারে। এছাড়া কোনো যাকাতদাতা বা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ চাইলে যে কোনো সময় প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করার ব্যবস্থা ও সক্ষমতা থাকতে হবে।

১৮. যাকাত ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতি প্রতিরোধ

যে কোনো সংস্থায় নিয়োজিত জনবলের নৈতিক স্খলনের ঝুঁকি থাকবেই। তবে এরূপ ঝুঁকি কমানোর জন্য প্রথমত, সিস্টেম ডেভেলপ করা বিশেষতঃ ডিজিটাল পদ্ধতি অনুসরণ; দ্বিতীয়ত, দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা; এবং তৃতীয়ত, ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে কর্মীদের উজ্জীবিত করা।

যাকাত সংস্থার ক্ষেত্রে নৈতিক পদস্খলন ও দুর্নীতির বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। যাকাতের প্রতিটি অর্থ ও সম্পদ যাকাত কর্মচারীর কাছে আমানত হিসেবে রক্ষিত থাকে। যাকাতের হকদার ব্যক্তিদের কাছে তা যথাযথভাবে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার গাফেলতি ও অনৈতিকতা গ্রহণযোগ্য নয়। এমতাবস্থায়, যাকাত সংস্থার দায়িত্ব হবে তার সার্বিক কার্যাবলীকে ডিজিটাল সিস্টেমে রূপান্তরিত করা এবং এমন সব বিধিবিধান প্রণয়ন করা যাতে দোষী ব্যক্তিদের সহজে শনাক্ত করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা দেয়া যায়। প্রয়োজনে দেশে বিদ্যমান আইনেরও সহায়তা নেয়া যেতে পারে। অধিকন্তু প্রতিটি যাকাত কর্মচারীকে তাকওয়াবান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও নসিহতের ব্যবস্থা করতে হবে।

আমীল (যাকাত কর্মচারী) প্রশাসন

যাকাত ব্যবস্থাপনার মূলনীতির (ZCP) ৮ নং ক্রমিকে যাকাত কর্মচারী প্রশাসন সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। যাকাত ব্যবস্থাপনায় বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন। ওয়ার্ল্ড যাকাত এন্ড ওয়াকফ ফোরাম বিষয়টির উপর Good Amil Governance (GAG) শীর্ষক একটি দলিল প্রণয়ন করেছে এবং তা সংস্থার বার্ষিক সম্মেলনে গ্রহীত হয়েছে। এতে যে সকল নির্দেশক উল্লেখ করা হয়েছে যা নিম্নরূপ :

১. যাকাত কর্মচারীর সংজ্ঞা

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট দেশের প্রযোজ্য আইন বা যাকাত সংস্থার দলিলে 'আমেলীন' এর সংজ্ঞা উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। 'আমীল' বা যাকাত কর্মচারীর এশটি সংজ্ঞা রয়েছে। World Zakat & Waqf Forum- এর মতে, সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার নীতিনির্ধারকরা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে 'আমীল' এর সংজ্ঞা এবং তাদেরকে নিয়োগের শর্তাবলি নির্ধারণ করতে পারে। তারা যে সংজ্ঞাটি দিয়েছে তা নিম্নরূপ : Amil is a person or group of persons or an institution authorized to collect, mobilize, administer, disburse and account for Zakat and the charities through state or other legally binding bodies. এছাড়াও এতে যাকাত সংস্থার সার্বিক কার্যাবলী ও কর্মপরিধি অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

২. যাকাত তত্ত্বাবধানকারী কর্তৃপক্ষ

কোনো দেশে আইনের আওতায় গঠিত যাকাত তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ থাকলে তারা নিয়মিতভিত্তিতে যাকাত সংস্থার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে।

৩. আমীলের অধিকার ও দায়িত্ব

যে দেশে যাকাত ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ রয়েছে তারাই সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধানের আওতায় আমীলের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করবেন। তবে, যেখানে সেরূপ আইন বা কর্তৃপক্ষ নেই, সেখানে যাকাত সংস্থার মেমোরেন্ডামে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। বিশেষ করে যাকাত সংস্থার কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও পরিচালন ব্যয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকবে। যেমন- ইসলামিক সম্মেলন সংস্থার (OIC) ফিকাহ বোর্ডের একটি মতামত হচ্ছে, আমীল বা পরিচালন ব্যয় (Operating Cost) হিসেবে মোট যাকাত সংগ্রহের ১২.৫% ভাগের বেশি হতে পারবে না। সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট এ নীতি অনুসরণ করে থাকে। বিশেষ ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম প্রয়োজন হতে পারে, তবে তা শরীয়াহ বোর্ডের অনুমতি নিয়ে করতে হবে।

৪. যাকাত সংস্থার পরিচালনা নির্দেশিকা

যাকাত সংস্থার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কর্মসূচি ও প্রকল্প তৈরি করতে হবে এবং সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য আবার বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, যাকে আধুনিক পরিভাষায় Standard Operating Procedure (SOP) তৈরি করতে হবে। এতে যাকাতভিত্তিক কর্মসূচি বা প্রকল্প গ্রহণের নীতিমালা এবং বাস্তবায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি সবিস্তারে বর্ণনা করা হবে। এসব নীতিমালা ও নির্দেশিকা অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোাদন নিয়ে কার্যকর করতে হবে। তারা সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামোতে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ সৃষ্টি করে নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাদের মাধ্যমে সার্বিক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করতে পারে। ম্যানুয়ালে যে সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে তার উদাহরণ নিম্নরূপ:

ক. যাকাত ও সাদাকাহ তহবিল সংগ্রহ ও সমাবেশ
খ. যাকাত সংস্থার কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা
গ. যাকাত বিতরণ কর্মসূচি
ঘ. জবাবদিহিতা ও দায়-দায়িত্ব
ঙ. প্রতিবেদন ও প্রকাশনা নীতি
চ. নৈতিকতার মানদণ্ড
ছ. শরীয়াহর বিধি-বিধান প্রতিপালন
জ. যাকাতের বিধি-বিধান ও দেশের প্রাসঙ্গিক আইন
ঝ. জনসংযোগের নীতিমালা
ঞ. স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা
ট. সংস্থার জনবল কাঠামো ও তার দক্ষতা বৃদ্ধি পরিকল্পনা
ঠ. যাকাত কর্মচারীদের বেতন ও পরিচালন ব্যয়
ড. বিরোধ মীমাংসার পদ্ধতি
ঢ. তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) নীতিমালা
ণ. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা

৫. যাকাত সংস্থার কার্যক্রম পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন

যাকাত সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য সুন্দর নীতিমালা বা ম্যানুয়েল প্রণয়ন করাই যথেষ্ট নয়। সে সব নীতিমালা ও প্রক্রিয়া অনুসরণ নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রকৃতপক্ষে, যাকাত সংস্থার সম্পাদিত সার্বিক কার্যক্রম পরিমাপ ও মূল্যায়নের মাপকাঠি ও নির্দেশক নির্ধারণ করে দেয়া উচিত। ওয়ার্ল্ড যাকাত ফোরাম কর্তৃক সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন দেশের কতিপয় যাকাত সংস্থার কার্যাবলির উপর সমীক্ষা চালিয়ে একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ইনডেক্স প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিটি যাকাত সংস্থা ঐ ইনডেক্স অনুসরণ করতে পারে। কোনো সংস্থা নিজস্ব কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য External Expert-ও নিয়োগ করতে পারে যিনি স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে তার কাজ মূল্যায়ন করবেন। তার পর্যালোচনা ও সুপারিশ সংস্থার সংশোধন, পরিমার্জন ও উন্নয়নে সহায়ক হতে পারে।

সংস্থার সার্বিক কার্যক্রম মূল্যায়নের পাশাপাশি তার জনবলের ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডের মূল্যায়নও (Performance appraisal) প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সংস্থা নিজস্ব মূল্যায়নের মানদণ্ড ও নির্দেশক প্রণয়ন করতে পারে। পাশাপাশি উত্তম কর্মসম্পাদনকারীদের জন্য পুরস্কার (Reward) এবং অসন্তোষজনক কর্মসম্পাদনের জন্য সংশোধনের সুযোগ বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

৬. *যাকাত ব্যবস্থাপনা নীতি বাস্তবায়নে পৃথক ইউনিট*

যাকাত ব্যবস্থাপনার নীতি বাস্তবায়নে বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে কোনো বিভাগ বা বিশেষভাবে নিয়োজিত দায়িত্বশীল থাকা উচিত যিনি নীতিমালা ও ম্যানুয়ালের অনুসৃতি সর্বদা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং বোর্ডকে অবহিত করবেন। সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা ব্যক্তি কীভাবে, কোন প্রক্রিয়ায় তার পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদন করবেন তা বোর্ড ঠিক করে দেবে।

উক্ত বিভাগ ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক বা বার্ষিক ভিত্তিতে বোর্ডের নিকট প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে। নীতিমালা ও ম্যানুয়াল বাস্তবায়নে কোনো প্রতিবন্ধকতা বা সমস্যা দেখা দিলে উক্ত বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিভাগকে দিক-নির্দেশনা বা পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করবে।

৭. *সংস্থার পরিচালনা বোর্ডের দায়িত্ব*

যাকাত সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে সংস্থার ঘোষিত উদ্দেশ্য (Objective) অর্জনের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন, নির্দেশনা প্রদান

এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করা। সাধারণতঃ সংস্থার জন্য রাষ্ট্র অনুমোদিত মেমোরেন্ডামে বোর্ডের কার্যাবলী ও দায়িত্ব বিধৃত থাকে। পাশাপাশি যাকাত একটি মৌলিক ইবাদাতের বিষয় হওয়ায় পুরো সংস্থার জনবলের বৈশিষ্ট্য ও কার্যক্রমে ইসলামী নৈতিকতার প্রতিফলন থাকতে হবে। এ জন্য পরিচালনা পর্ষদের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে Code of Conduct প্রণয়ন করা যাতে ইসলামী মূল্যবোধের অনুসৃতি নিশ্চিত করা যায়।

৮. পরিচালনা পর্ষদের কার্যাবলি মূল্যায়ন

যাকাত সংস্থার পরিচালনা পর্ষদ তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছে কিনা তা পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা (mechanism) থাকা প্রয়োজন। মেমোরেন্ডামের আলোকে পর্ষদ তার দায়িত্ব সম্পাদন করেছে কি না তা মূল্যায়নের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বিশেষজ্ঞ বা সংস্থা নিয়োগ করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এর ফলে পর্ষদ যেকোনো সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি চিহ্নিত করে সংশোধন ও পরিমার্জনের পদক্ষেপ নিতে পারবে।

৯. যাকাত সংস্থার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম মূল্যায়ন

যাকাত সংস্থার একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নেতৃত্বে একটি ব্যবস্থাপনা টিম (আমীল) কাজ করে। উক্ত টিম সুচারুভাবে তাদের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদন করে কিনা তা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করার জন্য বোর্ডের নিজস্ব একটি ব্যবস্থা থাকা দরকার। এর জন্য বোর্ড ব্যবস্থাপনা টিমকে মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক বা বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করার জন্য নির্দেশনা দিতে পারে। তবে বোর্ডের উদ্যোগে বছরে অন্তত : একবার বার্ষিক প্রতিবেদন পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে নির্দেশনা দেয়ার ব্যবস্থা থাকা উচিত। এ কাজটি করার জন্য বোর্ড World Zakat Performance Index- এর মত ইনডেক্স তৈরি করে নিতে পারে।

১০. আমীল উন্নয়ন ও প্রত্যয়ন প্রদান

সংস্থাকে যাকাত কর্মচারী তথা আমীলদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও যাকাত বিষয়ক জ্ঞান উন্নয়নের জন্য মানসম্মত কর্মসূচি নিতে হবে এবং এজন্য প্রত্যয়নপত্র দেয়া যেতে পারে। যেমন বাহরাইনভিত্তিক Accounting and Auditing of Islamic Financial Institutions (AAOIFI)

শরীয়াহর অডিট কোর্স প্রবর্তন করেছে যার আওতায় শরিয়াহ অডিটর সার্টিফিকেট দিয়ে থাকে। বাংলাদেশের ইসলামিক ব্যাংক ও বিমা কোম্পানিগুলো সার্টিফাইড মুরাকিব নিয়োগ করে থাকে; তেমনি আমীল নিয়োগের শর্ত হিসেবে Amil Development Course -এর সার্টিফিকেট দেয়া যেতে পারে। আমীলদের যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সে লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন করা যেতে পারে। সংস্থার যাকাত কর্মচারী সম্পাদিত কার্যক্রম তথা দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য Performance Appraisal System থাকতে হবে।

১১. *আমীলদের অনৈতিকতা প্রতিরোধ*

যাকাত কর্মচারীদের কোনো প্রকার অনৈতিক কর্মকাণ্ড বা দুর্নীতি চিহ্নিত করার জন্য নিজস্ব নীতি ও পদ্ধতি থাকতে হবে। পাশাপাশি অনৈতিকতা প্রতিরোধের যেমন ব্যবস্থা থাকতে হবে, তেমনিভাবে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে গেলে তার প্রতিকারেরও কার্যকর ব্যবস্থা থাকতে হবে। কর্মচারীদের অনৈতিক কর্মকান্ড প্রতিরোধের অংশ হিসেবে পরিচালনা পর্ষদ আলাদা কমিটি গঠন করে তাদেরকে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিধি (ToR) নির্ধারণ করে দিতে পারে।

১২. *তথ্য প্রকাশ ও স্বচ্ছতা*

যাকাত সংস্থার সার্বিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম অবশ্যই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ভিত্তিতে সম্পাদিত হতে হবে। এ উদ্দেশ্যে সংস্থাটি কখন, কীভাবে তার কার্যক্রমের তথ্য স্টেকহোল্ডারদের কাছে তুলে ধরবে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতি থাকতে হবে। এর মধ্যে শরীয়াহ বোর্ডের প্রতিবেদন, নিরীক্ষিত বার্ষিক ব্যালেন্স শীট ও আর্থিক বিবরণী অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

১৩. *শরীয়াহর বিধি-বিধান অনুসরণ*

যাকাত সংস্থাকে অবশ্যই যাকাত ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী সম্পাদনে শরীয়াহর বিধান অনুসরণ করতে হবে। এ মর্মে যাকাত সংস্থার মূল দলিলে এর অঙ্গীকার সুস্পষ্টভাবে বিধৃত থাকতে হবে। শরীয়াহর বিধি-বিধান সঠিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই করার জন্য

সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড ও নির্দেশক ঠিক করে নিতে হবে। শরীয়াহ বিধান অনুসরণে যাতে কোনো প্রকার বিঘ্ন না ঘটে সেজন্য প্রক্রিয়া ও পন্থা নির্ধারণ করে নিতে হবে। শরীয়াহ সুপারভাইজারি বোর্ডকে সংস্থার শরীয়াহ প্রতিপালন বিষয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে।

১৪. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

সারা বিশ্বব্যাপী ইসলামের অনুসারীদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। একদিকে মুসলিম উম্মাহর কোনো কোনো জনপদের অধিবাসীরা চরম নিপীড়ন-নির্যাতন, বৈষম্য ও দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত; অপরদিকে ইসলামী আকিদা ও ইবাদাত অনুসরণের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি পাশ্চাত্যের মুসলিম সংখ্যালঘু দেশগুলোতেও মুসলিমরা স্বীয় মূল্যবোধ ও জীবনাচরণের স্বাতন্ত্র বজায় রাখার অবিরাম চেষ্টা করছে। ইসলামের মৌলিক ইবাদাতগুলোর মত যাকাতের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার অঙ্গীকার নিয়ে বিভিন্ন দেশে যাকাত সংস্থা গড়ে উঠেছে এবং এর ফলে বিগত এক দশকে যাকাত একটি আন্দোলন হিসেবে দানা বাঁধছে।

জাতিসংঘের উদ্যোগে বৈশ্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে Sustainable Development Goals (SDG) গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ১৭টি প্রধান লক্ষ্য রয়েছে যা ২০২০-২০৩০ সাল সময়কালে অর্জনের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। ১৭টি লক্ষ্যের প্রায় সবগুলোই যাকাত গ্রাহকদের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। যেমন ক্ষুধার্তকে খাদ্যদান, দারিদ্র্যবিমোচন, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ইত্যাদি। জাতিসংঘ মনে করে যে, এসডিজি লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে পরিমাণ সম্পদের সমাবেশ ও বিনিয়োগ করতে হবে তার খুব কমই সংস্থান হয়েছে। এজন্য তারা অর্থ সংস্থানের বিভিন্ন উৎস খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারা করেছে যে, ধর্মীয় চ্যারিটি তথা যাকাত হিসেবে মুসলিমরা প্রতিবছর বিলিয়ন বিলিয়ন অর্থ পরিশোধ করে থাকে। এই লুকায়িত সম্পদ বঞ্চিত মানুষের কল্যাণে লাগানো যেতে পারে বিধায় তারা যাকাত ও ওয়াকফ ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। উল্লেখিত দু'টো বিষয়কে সামনে রেখে দেশ-বিদেশে যাকাত সংস্থাগুলোর মধ্যে পারস্পরিক মতবিনিময় ও সহযোদ্ধা সহযোগিতা বৃদ্ধির নীতিগত ব্যবস্থা থাকতে হবে।

যাকাত ব্যবস্থাপনায় শরীয়াহর অনুসৃতি

যাকাত একটি ফরজ ইবাদাত বিধায় এর সঠিক অনুশীলন হতে হবে শরীয়াহ বিধি-বিধানের আলোকে। ব্যক্তি পর্যায়ে শরীয়াহর অনুসৃতি কখনো কখনো কঠিন হয়ে পড়তে পারে। তাই প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই শরীয়াহ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এলক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নিতে হবে :

প্রথমত, সরকারি বা বেসরকারি যে পর্যায়েই হোক না কেন যাকাত ব্যবস্থাপনা সংস্থার উদ্যোগে শরীয়াহ সুপারভাইজারি বোর্ড গঠন করা প্রয়োজন। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কুরআন সুন্নাহ তথা শরীয়াহর বিধি-বিধান সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি রয়েছে সেরূপ স্কলার তথা আলেমদের নিয়ে শরীয়াহ বোর্ড গঠন করতে হবে। শরীয়াহ বোর্ডের সদস্যরা যাকাত সংস্থার কর্মচারী/প্রশাসক হবেন না। তবে তাদেরকে সম্মানী বা ফি দেয়া উচিত। তারা হবেন স্বাধীন এবং ধর্মীয় বিষয়ে মতামত প্রদানে সক্ষম ব্যক্তি।

যাকাত সংস্থার মূল দলিলে শরীয়াহ সুপারভাইজারী বোর্ড গঠন ও তার কাঠামো এবং তার কার্যাবলি ও কর্মপরিধি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। সদস্যদের যোগ্যতা কী হবে এবং তাদের জন্য সম্মানী কী পরিমাণ হবে তাও সংস্থার পরিচালনা পর্ষদ ঠিক করে দেবে। তদুপরি শরীয়াহ বোর্ড তাদের সামনে উপস্থাপিত বিষয়গুলো কীভাবে মীমাংসা করবে এবং এক্ষেত্রে মতামত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ কী সংখ্যাধিক্যের মতামতের ভিত্তিতে নাকি সর্বসম্মত মতামতের ভিত্তিতে হবে তার নীতিমালা থাকতে হবে। WZWF-এর পরামর্শ মোতাবেক বছরে অন্ততঃ একবার গভর্নিং বোর্ড ও শরীয়াহ বোর্ডের একটি যৌথসভা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।

দ্বিতীয়ত, শরীয়াহ বোর্ডের বিবেচনার জন্য যাকাত সংস্থার সঠিক কর্ম পরিকল্পনা তথা যাকাত তহবিল ও বিতরণ, যাকাত কর্মচারীদের কর্মপরিধি সংস্থার কর্মকৌশল, নীতিমালা ও কর্মসূচি, তার হিসাব সংরক্ষণ ইত্যাদি উপস্থাপন করতে হবে। শরীয়াহ বোর্ডের অনুমোদন ব্যতীত সংস্থার কোনো কার্যক্রম বাস্তাবায়ন করা যাবে না। এ বিষয়ে

যাকাত সংস্থার গঠনতন্ত্র বা মেমোরেন্ডামে পূর্ণাঙ্গভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। এ কথাও নিশ্চিত করতে হবে যে, যাকাত সংস্থার পরিচালনা পর্ষদে গৃহীত কোনো সিদ্বান্ত যদি শরীয়াহর সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হয় এবং শরীয়াহ বোর্ড তা অনুমোদন না করে তাহলে পর্ষদের অনুরূপ সিদ্ধান্ত বাতিল বলে গণ্য হবে।

তৃতীয়ত, শরীয়াহ বোর্ডের সদস্যদের জন্য এমন পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে যাতে তারা নিঃসঙ্কোচে সঠিক মতামত পেশ করতে পারেন। পরিচালনা কর্তৃপক্ষ বা অন্য কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারা নিরব থাকবেন বা কারো মর্জি মাফিক মত দিবেন তা যেন না হয়।

চতুর্থত, শরীয়াহ বোর্ড যাকাত সংস্থার কার্যক্রমের নিরীক্ষা করার জন্য একটি অডিট স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করবেন এবং এক্ষেত্রে ওয়ার্ল্ড যাকাত এন্ড ওয়াকফ ফোরাম ও ইন্দোনেশিয়ান যাকাত সংস্থা BAZNAS প্রণীত শরীয়াহ অডিট ইনডেক্স-এর সাহায্য নিতে পারেন।

পঞ্চমত, শরীয়াহ বোর্ড যাকাত সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম নিরীক্ষা ও পরিদর্শন করার জন্য মুরাক্বিব বা শরীয়াহ অডিটর নিয়োগের সুপারিশ করতে পারে এবং তাদেরকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য দিকনির্দেশনা দিতে পারে। মুরাক্বিব বা শরীয়াহ অডিটর নিয়োগের ক্ষেত্রে বাহরাইন ভিত্তিক AAOFI-র সার্টিফাইড অডিটরদের প্রাধান্য দিতে পারে।

ষষ্ঠত, শরীয়াহ অডিটর নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের নিয়োগের শর্তাবলি ও যোগ্যতা কী হবে তা শরীয়াহ বোর্ড নির্ধারণ করে দিতে পারে। সব দেশে সার্টিফাইড শরীয়াহ অডিটর সহজলভ্য নাও হতে পারে, সেক্ষেত্রে নিয়োগের পর তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিতে হবে। প্রশিক্ষণ দেয়ার ক্ষেত্রে শরীয়াহ বোর্ডের সদস্যগণ নেতৃত্ব দিবেন।

সপ্তমত, শরীয়াহ বোর্ডের প্রধান কর্তব্য হবে যাকাত সংস্থার উত্থাপিত বিভিন্ন শরীয়াহ সংশ্লিষ্ট ইস্যুর ব্যাপারে মতামত দেয়া এবং সংস্থার কার্যক্রমের উপর পরিচালিত শরীয়াহ অডিটের ভিত্তিতে বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা এবং তা সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন

করা। অপরদিকে সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট যে সব মুযাক্কী (যাকাতদাতা) রয়েছেন তাদের কাছে শরীয়াহ অডিট প্রতিবেদন উপস্থাপন করা।

অষ্টমত, আধুনিক যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থ ও মুদ্রা ব্যবস্থায় নতুন নতুন পুঁজি ও ইন্সট্রুমেন্ট উদ্ভাবিত হয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে হালাল সম্পদের যাকাত নির্ণয়ে নতুন নতুন প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে। এসব জটিল বিষয়াদির উপর মাসয়ালা বা মতামত প্রদান করার জন্য গবেষণা, অধ্যয়ন, সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে শরীয়াহ বোর্ডের সদস্যদের আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে যথাসম্ভব হালনাগাদ তথ্য ও জ্ঞান থাকতে হবে। এজন্য যাকাত সংস্থার রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট উইং চালু করা যেতে পারে।

নবমত, সাম্প্রতিককালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ফিকহ শাস্ত্রের উপর বিভিন্ন গবেষণা চালাচ্ছে বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তি। বিশেষ করে যাকাতের উপর ড. ইউসুফ আল কারযাভীর 'ফিকহুয যাকাত' গ্রন্থটি সকলের কাছে সমাদৃত হয়েছে যা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বইটির বাংলা ভাষ্য হচ্ছে 'ইসলামের যাকাত বিধান'। এছাড়া ওআইসি ফিকহ কাউন্সিল, কুয়েত যাকাত হাউজ প্রভৃতি সংস্থা যাকাতের উপর বিভিন্ন দলিল প্রকাশ করেছে।

দশমত, যাকাত সংস্থা যারা পরিচালনা করেন এবং যাকাত বোর্ডের যারা সদস্য থাকেন তাদের মধ্যে যাতে ধারণাগত কোনো দূরত্ব না থাকে এবং একই উদ্দেশে একই চিন্তা চেতনায় একাত্ম থাকেন সেজন্য বছরে অন্ততঃ একবার পরিচালনা পর্ষদ ও শরীয়াহ বোর্ডের যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যাকাত প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

যে কোনো প্রতিষ্ঠানকে তার পরিচালনাগত বা আর্থিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয়। যাকাত সংস্থার ক্ষেত্রেও তা হতে পারে। তবে কার্যকর সংস্থাগুলোর দায়িত্ব হচ্ছে যে কোনো ঝুঁকি মোকাবেলা বা প্রশমনের জন্য কিছু নীতি ও ব্যবস্থাপনা কৌশল অবলম্বন করা।

যাকাত প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় যাকাত বোর্ড (BAZNAS) এবং সে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক যৌথভাবে একটি দলিল (Document) প্রণয়ন করে যা ইন্দোনেশিয়ার যাকাত সংস্থাগুলো অনুসরণ করে। পরবর্তীতে World Zakat & Waqf Forum সেটিকে রেটিফাই করে। যাকাত সংস্থার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিষয়টি Zakat Core Principles- এর ১১ থেকে ১৪ নং নীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ দলিলটি যেকোনো যাকাত সংস্থা নিজেদের জন্য সঙ্গতিপূর্ণ করে নিতে পারে। বিষয়টি বিস্তারিতভাবে নিম্নে তুলে ধরা হয়েছে :

১. *অন্য দেশে যাকাত প্রেরণে ঝুঁকি*

ক. কোনো দেশের 'অফিসিয়াল সিক্রেটস এ্যাক্ট'-এর কারণে যাকাত সংশ্লিষ্ট তথ্য ও উপাত্ত সহজলভ্য নাও হতে পারে। আবার সংশ্লিষ্ট যাকাত সংস্থা তাদের সব তথ্য শেয়ার করতে সম্মত নাও হতে পারে। অপরদিকে, কোনো কোনো সংস্থার হয়তো তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণের সঠিক ব্যবস্থাপনাই গড়ে উঠেনি।

খ. কোনো দেশের আর্থিক ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় সংকট দেখা দিতে পারে এবং এমনকি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা বা অন্য কোনো জটিলতায় পতিত হতে পারে। সেরূপ ক্ষেত্রে অধিকতর চাহিদা থাকা দেশগুলোতে যাকাত তহবিল প্রেরণে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

গ. দাতা বা যাকাত গ্রহণকারী দেশে সংশ্লিষ্ট আইনের অনুপস্থিতি থাকতে পারে, যার মাধ্যমে যাকাতের হকদার ৮ (আট) শ্রেণির 'আসনাফ' শনাক্ত করা কঠিন হতে পারে। আবার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মাযহাব অনুসরণে প্রাধান্য থাকার কারণে আসনাফ শনাক্তকরণে মাসয়ালাগত ভিন্নতা হতে পারে।

ঘ. বৈশ্বিক বাস্তবতা হচ্ছে যে, বিশ্বের বহু দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও অভ্যন্তরীন গোলযোগ এমনকি যুদ্ধ পরিস্থিতি বিরাজ করছে। ফলে যাকাতদাতা বা যাকাত গ্রহণকারী দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও যাকাত তহবিল হস্তান্তর সহজে

সম্ভব নাও হতে পারে। আবার সংশ্লিষ্ট দু'দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সুসম্পর্ক না থাকলে পরিস্থিতি আরো জটিল হতে পারে।

ঙ. সংশ্লিষ্ট দু'টো দেশের মধ্যে যাকাত হস্তান্তর সংক্রান্ত আইন নাও থাকতে পারে। আবার কোনো দেশের বিদ্যমান আইনের সাথে যাকাত সংক্রান্ত শরীয়াহ বিধি-বিধানে সামঞ্জস্যতা নাও থাকতে পারে। অন্যদিকে, কোনো দেশের যাকাত সংস্থা পুরোপুরি সরকার নিয়ন্ত্রিত, আবার কোথাও বেসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত হলে সেক্ষেত্রে যাকাত তহবিল অন্য দেশে প্রেরণে বা গ্রহণের প্রক্রিয়াগত ভিন্নতা হতে পারে।

চ. যাকাত বিরোধ মীমাংসার জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক সালিশী (Arbitration) ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত গড়ে উঠেনি। অপরদিকে, বিভিন্ন মুসলিম দেশে পর্যাপ্ত আইনি কাঠামোর অভাবে যাকাত সংস্থাগুলো তাদের কর্মসূচিভিত্তিক তহবিল বরাদ্দের ক্ষেত্রে কোনো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে বাধ্য নয়।

ছ. দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব রয়েছে। এমনকি বিভিন্ন যাকাত সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও মতবিনিময়ের তেমন কার্যকর উদ্যোগ নেই। আবার কোনো দেশে হয়তো উল্লেখ করার মতো যাকাত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেনি।

জ. এখন পর্যন্ত যাকাত ব্যবস্থাপনার সর্বজনগ্রহণযোগ্য আন্তর্জাতিক মানদণ্ড (Standard) গড়ে উঠেনি। WZWF এ সংক্রান্ত দলিল প্রণয়ন করলেও তা সব দেশের কাছে এখনো জনপ্রিয় হয়ে উঠেনি। আবার যাকাত ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইনি কাঠামো বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম, কোনো কোনো দেশে আদৌ কোনো আইন নেই। একইভাবে যাকাত হিসাব সংরক্ষণের কোন প্রকার আন্তর্জাতিক মানদণ্ড গড়ে উঠেনি।

ঝ. ২০০১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্কের টুইন টাওয়ারে বিমান হামলার পর মার্কিন সরকার 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধ' ঘোষণা করে। এর ফলে বিশ্বের 'সন্ত্রাসী' বলে কথিত বিভিন্ন সংস্থার প্রতি কড়া নজর রাখা হয়। বিভিন্ন দেশের সরকারি নীতি ও আইনি কাঠামোতেও 'জিরো টলারেন্সের' দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়। তবে 'সন্ত্রাস' বিষয়টির সংজ্ঞা ও প্রায়োগিক বিষয়ে বৈশ্বিকভাবেই মতের ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে যাকাত তহবিল বণ্টন ও হস্তান্তরে নানাপ্রকার বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়। সন্ত্রাসীরা যাতে কোনো প্রকার ধর্মীয় অনুদান পেয়ে সুবিধা না পায়, সেজন্য আন্তর্জাতিক ও দেশীয়ভাবে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হয়। বাস্তবে এমনটি হতে পারে যে, সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার ও যাকাত সংস্থার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির মতপার্থক্যও দেখা দিতে পারে।

ঞ. বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এটাও একটি বাস্তবতা যে, বিভিন্ন অপরাধী চক্র মানিলন্ডারিং (অর্থপাচার), মানবপাচার, সন্ত্রাসীদের অর্থায়ন, অস্ত্র চোরাচালান ইত্যাদি অপরাধের সাথে জড়িত রয়েছে। এ ক্ষেত্রে যাকাত সংস্থা বা যাকাত গ্রাহক উভয় দেশের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যাতে কোনো প্রকার আইনিকাঠামোর অভাব বা অসতর্কতার কারণে যাকাত তহবিল কোনো অপ্রত্যাশিত হাতে চলে না যায়।

২. *যাকাত সংস্থার সুনাম ক্ষুণ্ন হওয়া ও আস্থা হারানোর ঝুঁকি*

যেসব দেশে যাকাত রাষ্ট্রীয় খাতে প্রদান করা বাধ্যতামূলক নয়, সেখানে যাকাত দাতারা নিজের পছন্দমত যাকাত সংস্থার কাছে তার যাকাত প্রদান করতে পারে। সে ক্ষেত্রে তারা অবশ্যই যে সব সংস্থার উচ্চমাত্রায় সুনাম ও স্বচ্ছতা রয়েছে তাদের প্রতিই আস্থা রাখেন। কিছু কারণে যদি সেই সংস্থার সুনাম প্রশ্নবিদ্ধ হয় তাহলে তার প্রতি যাকাতদাতারা আস্থা হারিয়ে ফেলতে পারে। যেখানে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক নয়, সেখানে যাকাতদাতাদের আলাদা আলাদাভাবে সন্তুষ্ট রাখা খুব সহজ নয়। কারণ, একেকজন একেকভাবে রিপোর্টিং চান বা

নানা শর্ত আরোপ করে থাকেন। আরো যেসব ক্ষেত্রে সুনাম ক্ষুণ্ন হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক. যাকাত সংস্থার ভিশন, মিশন ও উদ্দেশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা না করা; অথবা থাকলেও তা অস্পষ্ট এবং সহজে বোধগম্য নয়। আবার এসব বিষয়গুলো অর্জনের জন্য সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো ও কর্মসূচি নেই। এ ধরনের সংস্থার পক্ষে যাকাতদাতাদের আস্থা অর্জন করা সম্ভব নয়।

খ. মুসলিম উম্মাহর মধ্যে যাকাত সংক্রান্ত জ্ঞান ও শিক্ষার অভাব রয়েছে। কোনো কোনো দেশে এটা এতটাই প্রকট যে, মুসলিম জনসাধারণ, সরকার তথা নীতি ও আইন প্রণেতা, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও যাকাত সংস্থার লোকদেরও যাকাত সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও ন্যূনতম ধারণায় দৈন্য রয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে সংশ্লিষ্ট সমাজে যাকাত সংস্থার মাধ্যমে যাকাত পরিশোধের উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় না। মুসলিম দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কারিকুলাম ও সিলেবাসে যাকাত সম্পর্কে শিক্ষণীয় বিষয় একেবারেই নেই বা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। যাকাত সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন ও শিক্ষিত করে তোলার জন্য যাতে বিস্তারিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যায়, সেজন্য পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ করা উচিত। বিষয়টি প্রধানতঃ মুসলিম সরকারের পক্ষ থেকেই করা উচিত।

গ. সুষ্ঠুভাবে যাকাত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিটি সংস্থাকেই বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ও আধুনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে তার নিজস্ব Management Information System (MIS) তথা সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হবে। আবার সেগুলো যাতে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের কাছে সহজলভ্য ও জবাবদিহিতামূলক হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। অপরদিকে, সংস্থার আর্থিক বিষয়ে স্বাধীন নিরীক্ষা কার্যক্রম না থাকলে সংস্থার সুনাম ক্ষুণ্ন হওয়ার যথেষ্ট আশংকা থাকবে। অনেক ক্ষেত্রে রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড না থাকা বা হালকাভাবে থাকা এবং আমলাতান্ত্রিক শ্লথগতির কারণে সংস্থার সুনাম ঝুঁকিতে পড়তে পারে।

ঘ. যাকাত সংস্থার নীতি-নির্ধারণী ও নিয়ন্ত্রণ পর্যায় বা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দুর্বল নেতৃত্ব থাকলে সংস্থার উপর যাকাতদাতাদের আস্থা কমে যেতে পারে। আবার নেতৃত্ব যদি ভুল সিদ্ধান্ত নেয় বা স্বার্থের সাথে সংঘাত (conflict of interest) সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে সংস্থা তার সুনাম হারাতে পারে।

ঙ. যাকাত সংস্থার আমীল তথা জনবল ব্যবস্থাপনায় যদি দুর্বল নীতি ও পদ্ধতি অনুসৃত হয় তাহলে সংস্থা তার পথ হারিয়ে ফেলতে পারে। Good Amil Governance তথা যাকাত কর্মচারীর সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য WZWF যে দলিল প্রকাশ করেছে তার অনুসৃতির অভাব থাকলে সংস্থা ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, সংস্থার পরিচালন ব্যয় যদি শরীয়াহসম্মতভাবে যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে না থাকে সে ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। সর্বোপরি, সংস্থার সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনায় ভারসাম্যতা বিধানের জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে নেতৃত্বের যোগ্যতার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে।

চ. যাকাত সংস্থার সম্ভাব্য আর্থিক ও অন্য প্রকার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য সংস্থার নিজস্ব প্রটোকল না থাকলে তাৎক্ষণিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করা সম্ভব হবে না। আবার, প্রটোকল থাকলেও দক্ষ ও কার্যকর বাস্তবায়নের অভাবেও সমস্যা দেখা দিতে পারে।

ছ. কোনো কারণে যদি যাকাত সংস্থার যাকাতদাতা (মুযাক্কী) সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে, তাহলে দ্রুত তার কারণ চিহ্নিত করে প্রতিকার গ্রহণ করতে না পারলে বিরাট ঝুঁকি দেখা দিতে পারে। বিশেষ করে শরীয়াহ প্রতিপালনে ব্যর্থতা বা যাকাতদাতার যুক্তিসঙ্গত প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হলে এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে।

জ. যাকাত তহবিল সংগ্রহের কারিগরি ব্যবস্থা যেমন ই-পেমেন্ট, এ্যাপস, এটিএম, ব্যাংক ইত্যাদির অভাবে বিশেষতঃ মফস্বল

এলাকা থেকে যাকাত প্রদানে যাকাতদাতারা সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে।

ঝ. যাকাত সংস্থার যাকাত সংগ্রহ সূচক (Collection Performance Indicator) না থাকলে তাঁর সম্পাদিত তহবিল সংগ্রহ কার্যক্রমের পরিমাপযোগ্য মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে না।

ঞ. যাকাত সংস্থার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ (Monitoring) ও মূল্যায়নের জন্য নিয়ন্ত্রণ সংস্থা, পরিচালনা পর্ষদ ও সাংগঠনিক কাঠামোতে Monitoring and Evaluation (M&E) ব্যবস্থা না থাকলে যাকাত ব্যবস্থাপনা ও অকার্যকর হওয়ার ঝুঁকি দেখা দিতে পারে।

ট. যাকাত সংস্থার কর্মচারী বা এর সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি বিভিন্ন অপরাধের তথা অর্থ আত্মসাৎ, প্রতারণা, চুরি ইত্যাদি কার্যক্রমের সাথে জড়িয়ে পড়তে পারে। এমনকি বাইরের কোনো পক্ষ যাকাত সংস্থার জন্য ক্ষতিকারক কোনো কাজ করে ফেলতে পারে। এরূপ ঝুঁকি মোকাবেলার ব্যাপারে সংস্থাকে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন ও কৌশলী হতে হবে।

ঠ. যাকাত সংস্থা যদি যাকাত ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি সাদাকাহ অনুদান ইত্যাদি তহবিল দিয়ে কোনো প্রকার বাণিজ্যিক উদ্যোগের সাথে জড়িয়ে পড়ে বা সংস্থার সুনাম ব্যবহার করে কেউ এরূপ বাণিজ্যিক উদ্যোগ নেয় তাহলে সংস্থার মূল লক্ষ্য ও কার্যক্রম বিঘ্নিত ও নীতি বিচ্যুতি ঘটতে পারে।

ড. কোনো দেশের সরকারি নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি যাকাত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সহায়ক নাও হতে পারে। আবার রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও অস্থিরতার কারণেও যাকাত প্রতিষ্ঠানের কাজ ব্যাহত হতে পারে।

ঢ. বর্তমানকালে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যাকাত সংস্থা যদি উপযুক্ত জনবল দিয়ে দাতাদের সাথে সংযোগ রক্ষা যথাযথভাবে করতে না পারে তাহলে বিভ্রান্তিকর প্রচারণার শিকার হতে পারে।

৩. যাকাত বরাদ্দ ও বিতরণের ঝুঁকি

যাকাত প্রাপক শনাক্ত করে যাকাত বিতরণ কর্মসূচিতে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করার পর যথাযথ সময়ে তহবিল হস্তান্তরে বিলম্ব বা ব্যর্থতা সংস্থার জন্য বিরাট ঝুঁকির কারণ হতে পারে। তহবিলের নিশ্চয়তা ব্যতীত এমন কোনো প্রকল্প গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত নয় যা যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। সুতরাং যাকাত সংস্থার উচিত হবে সংগৃহীত তহবিল ও নিশ্চিত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তহবিলের উপর ভিত্তি করে ভারসাম্যপূর্ণ বরাদ্দ ও বিতরণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা। Zakat Core Principles এর ১৩ নং নীতিমালায় বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। যাকাত বরাদ্দ বা বিতরণের ক্ষেত্রে কী কী ধরনের ঝুঁকির উদ্ভব হতে পারে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো :

ক. যাকাত প্রাপক (মুস্তাহিক) শনাক্তকরণের জন্য শরী'য়াহর আলোকে নীতিমালা থাকতে হবে। যাকাত প্রাপক (মুস্তাহিক) সনাক্তকরণ ও তাদের তথ্য-উপাত্ত (ডাটাবেজ) সঠিকভাবে প্রণয়ন করা না হলে শরীয়াহ প্রতিপালনে ঝুঁকি দেখা দিতে পারে। বাছাইকৃত মুস্তাহিকের দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকর ও সন্তোষজনক ব্যবস্থা করতে না পারলে যাকাত ব্যবস্থাপনার দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। আবার সব মুস্তাহিকের চাহিদা এক রকম নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে অগ্রাধিকারভিত্তিতে যেটি প্রয়োজন যাকাত থেকে তাদের সেটাই বরাদ্দ করতে হবে।

খ. মুস্তাহিকদের দু'টো শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। এমন পরিবার রয়েছে যেখানে উপার্জন বা উৎপাদন করার মত কোনো লোক নেই। যে বা যারা আছে তাদের বেঁচে থাকার জন্য মৌলিক চাহিদা পূরণ করা প্রয়োজন। এদেরকে সঠিকভাবে শনাক্ত করা এবং তাদের দোরগোড়ায় খাদ্য ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্য পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা না থাকলে যাকাত সংস্থার অদক্ষতা প্রমাণিত হবে। অপরদিকে, উৎপাদন বা উপার্জন সক্ষম পরিবারগুলোকে মূলধন ও প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থান তথা স্বাবলম্বী করার উদ্যোগ নিতে হবে। এদের জন্য

যাকাতভিত্তিক উৎপাদন ও কর্মসংস্থানমুখী প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

গ. পরিচালন ব্যয়ের ব্যাপারে যাকাত সংস্থার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকলে এবং সেক্ষেত্রে অযৌক্তিকভাবে যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণের অনুপাত নির্ধারিত হলে সংস্থার জন্য ঝুঁকি দেখা দিতে পারে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ওআইসি ফিকাহ বোর্ডের অভিমত অনুযায়ী যাকাত সংস্থার পরিচালন ব্যয় ১২.৫% এর বেশি হওয়া উচিত নয়। কারো কারো মতে, কখনো বাস্তব চাহিদা বিবেচনায় অন্তর্বর্তী সময়ে বা প্রাথমিক অবস্থায় এ হার বেশিও হতে পারে। এক্ষেত্রে শরীয়াহ বোর্ডের সম্মতি না নিয়ে পরিচালন ব্যয় নির্ধারণ করা ঠিক হবে না। আবার অব্যবস্থাপনায় অদক্ষতার কারণেও পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে।

ঘ. সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে যথাসময়ে যাকাত তহবিলে বিতরণে বিলম্বও কাম্য নয়। যাকাত সংস্থার কর্মচারীদের অদক্ষতা বা আমলাতান্ত্রিক ধীরগতির কারণে যাকাতভিত্তিক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিলম্ব হতে পারে। আবার, যাকাত বরাদ্দ করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ণয়ে ভুল সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে।

ঙ. যাকাত প্রতিষ্ঠান যাকাতভিত্তিক কোনো কর্মসূচি বা প্রকল্প বাস্তবায়নে অন্যকোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্বের (Partnership) ভিত্তিতে কাজ করতে পারে। এক্ষেত্রে পার্টনার সংস্থা বাছাইয়ের নীতিমালা না থাকলে বা যথাযথভাবে চুক্তি কার্যকর না হলে ঝুঁকি দেখা দিতে পারে। সংশ্লিষ্ট পার্টনার সংস্থার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকতে হবে। কোনো পার্টনার সংস্থার উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা কখনো ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে।

চ. যাকাত সংস্থার কর্মাধীন এলাকার বিভিন্ন স্থানের মুস্তাহিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা একরকম নয়। যেমন, একটি দেশের

কোনো কোনো জেলা বা প্রদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি অন্য এলাকার চেয়ে খারাপ হতে পারে। এক্ষেত্রে যাকাত সংস্থা যদি অগ্রাধিকার নির্ণয় ও যাকাত বরাদ্দের ক্ষেত্রে ন্যায্যতার পরিচয় দিতে না পারে, তাহলে তাঁর কর্মদক্ষতা ও বিশ্বস্ততা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারে। যাকাত সংস্থা যদি স্বেচ্ছামূলক যাকাত সংগ্রহ করে এবং যাকাতদাতার অভিপ্রায়কে অগ্রাধিকার দেয় সেক্ষেত্রে ন্যায্যতার ভিত্তিতে বরাদ্দ নাও হতে পারে। তাই কর্মসূচি ও এলাকাভিত্তিক যাকাত বরাদ্দ করার জন্য সংস্থার নিজস্ব নির্দেশক (Indicator) থাকা প্রয়োাজন।

ছ. যাকাতভিত্তিক কোনো প্রকল্প যদি ছড়ানো-ছিটানো বা দুর্গম এলাকায় থাকে সেখানে যথাসময়ে তহবিল বা সেবা পৌঁছানো একটা কঠিন কাজ। যাকাত কর্মচারীর অপ্রতুলতা, যানবাহন বা তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের অভাব এক্ষেত্রে পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলতে পারে।

৪. যাকাত সংস্থার পরিচালনা সংক্রান্ত ঝুঁকি

অভ্যন্তরীণ পরিচালন পদ্ধতি ও জনবলের দুর্বলতা বা বাহ্যিক কোনো কারণে যে কোনো সংস্থায় ঝুঁকি দেখা দিতে পারে। যাকাত সংস্থার পরিচালন ব্যবস্থার একটি পদ্ধতি (System) ও বিধি-বিধান থাকতে হবে। জনবলের কারিগরি দক্ষতার অভাব এবং সফটওয়্যার বা সিস্টেমে জটিলতা দেখা দিলে সংস্থার সামগ্রিক কাজের উপর তার নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। এমনকি বাইরের কোনো প্রকার অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ বা প্রতারণা ক্ষতিকারক হতে পারে। সার্বিক পরিচালন ব্যবস্থাটি আবার শরীয়াহর সাথে সংগতি রক্ষা করতে পারছে কিনা তাও লক্ষ্য রাখতে হবে। সংস্থা ও তার কার্যক্রমের কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা (Strategic Planning) ও সাংগঠনিক কাঠামো ঝুঁকি পরিহারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। Zakat Core Principles-এর ১৪ নং নীতিতে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এর বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে তুলে ধরা হয়েছে :

ক. যাকাত সংস্থার আর্থিক লেনদেন করার জন্য ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত হতে হয়। একদিকে ঐ ব্যাংকটি যেমন শরীয়াহভিত্তিক হতে হবে, তেমনি তার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা যদি কাঙ্ক্ষিত মানের না হয় তাহলে সেটি নগদ অর্থ (লিকুইডিটি) সংকটে দেউলিয়ার মুখোমুখি হতে পারে। এভাবে যাকাত সংস্থা বড় ধরনের ঝুঁকিতে পড়তে পারে।

খ. আধুনিক যুগে যাকাত ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে অবশ্যই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে, নচেৎ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা আনা সম্ভব হবে না। এ লক্ষ্যে দক্ষ ও যোগ্য কারিগরি জনবল যেমন প্রয়োজন, তেমনি আইসিটি সফটওয়্যার উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

৫. নৈতিকতার মানদণ্ড :

যাকাত সংস্থার কর্মচারী ও মুস্তাহিক, আমীল ও মুযাক্কী এবং আমীল বনাম আমীলদের মধ্যকার সম্পর্ক ও পারস্পরিক আচার-আচরণে নৈতিকতা যাতে বজায় থাকে সেজন্য নৈতিকতার মানদণ্ড (Code of Ethics) থাকা প্রয়োজন। আবার নৈতিকতার মানদণ্ডকে নির্মোহভাবে কার্যকর করা দরকার। এর অভাবে সংস্থার মূল্যবোধ ও শরীয়াহসম্মত পরিবেশ রক্ষা করা কঠিন হয়ে যাবে।

৬. হিসাব সংরক্ষণে ঝুঁকি

যাকাত সংস্থাকে অবশ্যই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের Accounting & Auditing Standard অনুসরণ করতে হবে; নচেৎ সুষ্ঠুভাবে হিসাব রক্ষণ করা সম্ভব হবে না। আর্থিক বিষয়ে রিপোর্টিং-এর ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করতে হবে। যাকাত সংস্থার হিসাব সংরক্ষণের দুর্বলতা পুরো সংস্থাকে মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে।

৭. প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংক্রান্ত ঝুঁকি

যে কোনো দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- বন্যা, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, খরা, অগ্নিকাণ্ড, মহামারি ইত্যাদি ক্ষেত্রে যাকাত সংস্থার পূর্বাভাস, জরুরি সহায়তা কর্মসূচি, বিশেষায়িত জনবল, লজিস্টিক প্রস্তুত রাখা ও ব্যবহার পরিকল্পনা না থাকলে সময়মত পদক্ষেপ গ্রহণ

করা সম্ভব হবে না। আবার মানবসৃষ্ট দুর্যোগেও বিপন্ন মানুষকে সহায়তা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়; যেমন, রাজনৈতিক নিপীড়ন ও যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বহু মানুষ ছিন্নমূল তথা শরণার্থী হয়ে পড়ে। এরূপ পরিস্থিতিতে যাকাত সংস্থা যাতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে সেজন্য নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা থাকা দরকার।

৮. জনবল সংক্রান্ত ঝুঁকি

যাকাত সংস্থায় আমীল নিয়োগের শর্তাবলি সাধারণ কোনো সংস্থার থেকে আলাদা। আমীল হওয়ার শর্ত পূরণ করে এমন যোগ্যলোক পাওয়া কখনো কঠিন হয়ে যেতে পারে। জনবলের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ঠিকমত না হলে সংস্থার কার্যক্রমে তার প্রভাব পড়বে। যাকাত বিষয়ক শরীয়াহর জ্ঞান যেমন অপরিহার্য, তেমনি জনবলের পুরস্কার ও শাস্তির (Reward and Punishment) ব্যবস্থাও থাকতে হবে।

৯. যাকাত সংস্থার পরিচালনায় নির্দেশক না থাকা

কার্যকরতা ও দক্ষতার সাথে যাকাত সংস্থার পরিচালনা কার্যক্রম সম্পাদিত হচ্ছে কি না তা দেখার জন্য পরিমাপক কাঠামো না থাকলে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা যাবে না। যাকাত সংস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উপর দাঁড় করানোর মধ্যে দিয়ে এরূপ ঘাটতি মোকাবেলা করা যেতে পারে।

১০. সংস্থার সম্পদ হারানোর ঝুঁকি

যাকাত সংস্থার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ রক্ষার জন্য কার্যকর পদ্ধতি ও নীতি অনুসরণ করা দরকার। বিশেষতঃ স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে আইনগত দলিলপত্র, ট্যাক্স প্রদান ইত্যাদি যেমন জরুরি, তেমনিভাবে অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে অবচয় (Depriciation) নীতিমালা ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ। এক কথায় সম্পদ ব্যবস্থাপনায় (Asset Management) দুর্বলতা থাকলে ঐ সম্পদ হারানোর ঝুঁকি দেখা দিতে পারে।

১১. ম্যানুয়াল না থাকার ঝুঁকি

যাকাত সংস্থার সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য Standard Operating Procedure (SOP) বা ম্যানুয়েল থাকতে হবে; নচেৎ সংস্থার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করা কার্যতঃ কঠিন হয়ে পড়তে পারে।

আবার কাগজে-কলমে সুন্দর (SOP) থাকলেও যদি তার বাস্তবায়ন ঠিকমত না হয় এবং তা পরিবীক্ষণের জন্য ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সংস্থা ভারসাম্য বিধান করে অগ্রসর হতে পারবে না। অধিকন্তু সংস্থা ISO-এর মত সার্টিফিকেট পাওয়ার প্রচেষ্টা চালাতে পারে।

১২. পরিকল্পনার দুর্বলতা

যাকাত সংস্থার তহবিল সংগ্রহ ও বিতরণের জন্য যদি সুষ্ঠু ও সঠিক পরিকল্পনা না থাকে তাহলে সংস্থা দক্ষতার পরিচয় দিতে পারবে না। আবার ভালো পরিকল্পনা, কর্মসূচি বা প্রকল্প প্রণয়নের জন্য যোগ্য জনবল (আমীল) প্রয়োজন। দক্ষ জনবলের অভাবে সংস্থার কাজে গতি আনা সম্ভব হয় না।

১৩. নির্ভরযোগ্য ডাটাবেজের অভাব

যাকাত সংস্থাকে অবশ্যই মুযাক্কী, মুস্তাহিক, প্রতিষ্ঠানের জনবল ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে নির্ভরযোগ্য ডাটাবেজ গড়ে তুলতে হবে; নতুবা সঠিকভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। আধুনিককালের সফটওয়্যার ব্যবহার করে নির্ভরযোগ্য ডাটাবেজ তৈরি করা যায়। তবে সেক্ষেত্রেও উপযুক্ত জনবল ও আইসিটি অবকাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন।

১৪. স্বেচ্ছাসেবক ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকি

যাকাত সংস্থায় কখনো কখনো স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগের প্রয়েজনীয়তা দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে সংস্থাকে অবশ্যই স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগের নীতিমালা, তাদের পারিশ্রমিক বা সম্মানী ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সুনির্দিষ্ট ম্যানুয়াল থাকতে হবে; নতুবা সংস্থাকে সমস্যায় পড়তে হতে পারে।

১৫. যাকাত সংস্থাগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা

দেশ-বিদেশের যাকাত সংস্থাগুলোর মধ্যে তাদের কর্মদক্ষতা, তহবিল সংগ্রহ, কর্মসূচি ও প্রকল্প প্রণয়ন, দারিদ্র্যবিমোচন ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা থাকবে-এটাই স্বাভাবিক। এরূপ প্রতিযোগিতার বিষয়টিকে ইতিবাচক বিবেচনা করে সে বিষয়ে সংস্থাকে কৌশল উদ্ভাবন ও নীতি প্রণয়ন করতে হবে। তবে কোনো প্রতিযোগী সংস্থা যদি অন্য সংস্থার বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারনা চালায় তা হবে ঝুঁকিপূর্ণ একটি ব্যাপার।

এজন্য প্রত্যেক সংস্থাকে পরিমিতিবোধ, শরীয়াহ নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করা উচিত।

১৬. যাকাত সংস্থার সম্প্রসারণ ঝুঁকি

যে কোনো ভালো কর্মসূচি বা প্রকল্প ক্ষুদ্র বা সীমিত পরিসরে গুণগতমান বজায় রেখে বাস্তবায়ন করা যতটা সহজতর; একই মডেল বৃহত্তর পরিসরে বাস্তবায়ন করতে গেলে তা ততটাই কঠিন হয়ে যায়। আবার দূর-দূরান্তে একই কর্মসূচি বাস্তবায়নে পরিবহন সংকট, পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি, জনবলের নিয়োগ সংকট আকারে দেখা দিতে পারে। এজন্য সংস্থাকে সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও দক্ষ জনশক্তি নিয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত।

১৭. শরীয়াহ অনুসৃতি ক্ষেত্রে ঝুঁকি

যাকাতদাতারা বিভিন্ন যাকাতযোগ্য সম্পদের যাকাতের হার নিরূপণে মাসলা-মাসায়েল সম্পর্কে জানতে চাইবেন, এটাই স্বাভাবিক। আবার যাকাত বিতরণে যাকাত প্রাপ্যতার বিষয়ে ফতওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। এছাড়া মাসলা-মাসায়েল প্রদানে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে। যাকাত সংস্থায় এসব প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য যথোপযুক্ত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ থাকতে হবে। শরীয়াহ বিশেষজ্ঞ বা শরীয়াহ বোর্ড না থাকলে সেই যাকাত সংস্থা সঠিক নির্দেশনা পাবে না। পাশাপাশি শরীয়াহ সংক্রান্ত অভিমত বা সিদ্ধান্ত কতটা মর্যাদার সাথে বাস্তবায়ন করা হবে তা সংস্থার মেমোরেন্ডামে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

১৮.রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান পালনে ঝুঁকি

সব মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে যাকাত ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বা সে সংক্রান্ত কোনো প্রকার আইন নেই। ফলে এটা সঠিকভাবে পরিবীক্ষণ করা হয় না যে, যাকাত সংস্থাগুলো সরকারি বিধি-বিধান কতটা অনুসরণ করে। আবার কোনো কোনো দেশে অসম্পূর্ণ বিধি-বিধান রয়েছে। রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থা পৃথকভাবে স্ব স্ব নিয়ন্ত্রণমূলক কাজ করে। যাকাত সংস্থা রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান সঠিকভাবে প্রতিপালন না করলে সংস্থাটি প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে।

১৯. সাপ্লাই চেইন এ্যান্ড মার্কেট এ্যাক্সেস ঝুঁকি

যে সব মুস্তাহিক পরিবারকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য মূলধন ও প্রশিক্ষণ দেয়া হবে, তাদের উৎপাদনের কাঁচামাল সরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টি হলে তাদের উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। একইভাবে মুস্তাহিকদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ ঠিকমত না হলে তারা ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হবে। অপরদিকে, যাকাত সংস্থা মুস্তাহিকদের মধ্যে বণ্টনের জন্য কোনো পণ্য বা সেবা ক্রয় করতে যেয়ে সমস্যা মোকাবেলা করতে পারে। সংস্থার পরিচালকদের এসব বিষয়ে কৌশলী হতে হবে।

২০. যাকাত সংক্রান্ত জ্ঞান ও শিক্ষার অভাব

বিভিন্ন মুসলিম দেশের নাগরিকদের যাকাত সম্পর্কে শিক্ষার অভাব রয়েছে। সেসব দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যেমন যাকাত বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত নেই, তেমনি আলেম সমাজও বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেন না। ফলে যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে মুসলিমদের মধ্যে অনীহা ও গাফেলতি দেখা যায়। আবার অনেক দেশে ব্যক্তি পর্যায়ে দায়সারাভাবে যাকাত প্রদান করা হলেও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যাকাত পরিশোধের ব্যাপারে সচেতনতার অভাব দেখা যায়।

২১. সংকটময় অর্থনীতির ঝুঁকি

কোনো দেশের সামষ্টিক অর্থনীতি (macro economics) যদি কোনো কারণে সংকটে পতিত হয়, তাহলে অন্যদের সাথে যাকাত সংস্থাও ঝুঁকিতে পড়তে পারে। মুযাক্কী সংখ্যা হ্রাস পেতে পারে এবং মুস্তাহিক সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে যাকাত তহবিল সংগ্রহে ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে দেশের অর্থনৈতিক নীতি-কৌশলের সাথে সঙ্গতি রেখে যাকাত সংস্থাকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাস্তবমুখী সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

বিভিন্ন দেশের যাকাত সংস্থাগুলোর মধ্যে জরিপের মাধ্যমে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তার উপর ভিত্তি করে উপরে উল্লেখিত ঝুঁকির ক্ষেত্রসমূহ বিন্যিত করা হয়েছে। এর বাইরেও অন্য কোনো ঝুঁকির বিষয় থাকতে

পারে। যে সংস্থা যতবেশি ঝুঁকিমুক্ত থাকতে পারবে বা দক্ষতার সাথে ঝুঁকির ব্যবস্থাপনা করতে পারবে তারা ততো বেশি সুফল পাবে।

যাকাত পারফরমেন্স ইনডেক্স

ওয়ার্ল্ড যাকাত এন্ড ওয়াকফ ফোরাম যাকাত ব্যবস্থাপনার একটি মানদন্ড নির্ধারণ করে একটি 'যাকাত পারফরমেন্স ইনডেক্স' প্রণয়ন করেছে যা সব দেশের যাকাত ব্যবস্থাপনা সংস্থাগুলোর কর্মসম্পাদনে একটি দিক-নির্দেশনা হিসেবে কাজ করতে পারে। এতে যাকাত সংস্থার আইনগত অবস্থান, যাকাত ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধান, যাকাত সংস্থা কর্তৃক তার কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রকাশ, যাকাত সংগ্রহ বিষয়ক নীতিমালা, যাকাত বিতরণ সংক্রান্ত নির্দেশনা ইত্যাদি বিষয়ের ইনডেক্স রয়েছে। উক্ত ইনডেক্সটি পরিশিষ্ট 'খ'-তে সংযুক্ত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়
বাংলাদেশে যাকাত ব্যবস্থাপনা

মুসলিম বিশ্বে যাকাত ব্যবস্থাপনা

ইসলামের যাকাত ব্যবস্থায় দারিদ্র্য দূরীকরণের সর্বোত্তম ব্যবস্থা রয়েছে যা ইতিহাসে একটি সুফলদায়ক নীতি বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু নানা কারণে তা মুসলামনদের মধ্যে সঠিকভাবে অনুসৃত হচ্ছে না। যাকাত প্রতিটি সম্পদশালী মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক ধর্মীয় ট্যাক্স। আবার তা আদায়ের দায়িত্বও প্রধানত ঃ সরকারের।

বর্তমান বিশ্বের কোনো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা বা দরিদ্রদের কাছে সম্পদ হস্তান্তরের কার্যকর ও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা দেখা যাচ্ছে না। বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোর দারিদ্র্যবিমোচন কৌশলপত্র বা সরকারি বাজেট বা উন্নয়ন পরিকল্পনায় যাকাতের কোনো উল্লেখ নেই। অথচ যাকাত হতে পারে দারিদ্র্যবিমোচন সংক্রান্ত উন্নয়ন বাজেটের বিরাট একটি উৎস।

বর্তমানে সৌদি আরব, পাকিস্তান, ইয়েমেন, সুদান, লিবিয়া, ব্রুনাই দারুসসালাম, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় সরকারি বা আধা-সরকারি ব্যবস্থাপনার আওতায় যাকাতকে আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অপরদিকে বাহরাইন, বাংলাদেশ, ইরান, জর্ডান, লেবানন, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, নাইজেরিয়া, কুয়েত ও আরব আমিরাতে সরকারি পর্যায়ে যাকাত তহবিল গঠন করা হয়েছে, তবে এসব দেশে মুসলিম নাগরিকদের যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক নয়। এসব দেশে আবার বেসরকারিভাবে যাকাত ব্যবস্থাপনারও সুযোগ রয়েছে। অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতে শুধুমাত্র বেসরকারিভাবে যাকাত ব্যবস্থাপনা চালু রয়েছে।

ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনায় যাকাত দিয়ে সমাজের দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের উন্নয়নে বিশেষ কিছু করা যায় না বিধায় অনেক দেশেই এখন বিভিন্ন

বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যাকাত তহবিল গঠন করে তাতে অংশগ্রহণের জন্য যাকাতদাতাদের আহ্বান জানাচ্ছে। তারা ঐক্যবদ্ধভাবে যাকাতকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য বিত্তবান ব্যক্তি ও কোম্পানিগুলোর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। আবার যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত ইত্যাদিসহ বিভিন্ন মুসলিম সংখ্যালঘু দেশেও বেসরকারিভাবে যাকাত প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। বাংলাদেশে 'সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট' একই উদ্দেশ্যে কাজ করছে।

বাংলাদেশে যাকাত ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের অধিবাসীদের ৯০% ভাগ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও এখানে যাকাত আদায় ও বিতরণ সঠিকভাবে হচ্ছে না। ব্যক্তি পর্যায়ে অনেকে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্তভাবে যাকাত প্রদান করলেও দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের কোনো ভূমিকা রয়েছে বলে প্রতিভাত হচ্ছে না। নীতি-নির্ধারকদের কাছেও অর্থব্যবস্থার অংশ হিসেবে যাকাতের কোনো গুরুত্ব নেই।

আমাদের দেশ ও সমাজের জন্য দারিদ্র্য একটি গুরুতর সমস্যা। দেশের অগণিত গরিব মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ব্যক্তি পর্যায়ে অনেকে গরিব আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীকে যাকাত থেকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকেন। কেউ কেউ আবার যাকাত হিসেবে শাড়ি-লুঙ্গি বিতরণ করেন। লক্ষণীয় যে, এভাবে যাকাতের নামে নামমাত্র সাহায্য প্রদান করে এর আর্থ-সামাজিক সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। মনে করুন, একজন গরিব মহিলাকে একাধারে পঞ্চাশ বছর ধরে প্রতি বছর ২টি করে শাড়ি দান করলে তার দারিদ্র্য কী দূর হবে? সহজ উত্তর হবে, না। মনে রাখতে হবে যে, যাকাতের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে দারিদ্র্যবিমোচন করে তাকে স্বাবলম্বী করা যাতে সে কিছুদিন পরে নিজেই যাকাত দিতে পারে। যাকাত দারিদ্র্যবিমোচন ও সামাজিক কল্যাণের জন্য একটি সার্থক ও কার্যকর কৌশল বিধায় বিচ্ছিন্ন ও

বিক্ষিপ্তভাবে যাকাত প্রদানের চাইতে ঐকবদ্ধ, সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা নিয়ে কাজ করা প্রয়োজন।

আমাদের সমাজে মুসলিম বলে পরিচিত হলেও অনেক বিত্তবান ব্যক্তি যাকাত পরিশোধ করেন না। অনেকে সুদের মত হারাম ব্যবসার সাথে জড়িত। সামান্য কিছুসংখ্যক ব্যক্তি আছেন যারা সঠিকভাবে হিসাব নিরূপণ করে সুষ্ঠুভাবে যাকাত দিয়ে থাকেন। বিরাট একটি অংশ আছেন যারা যাকাত দেন; কিন্তু কিছু সাধারণ ভুল করে থাকেন। যেমন:

ক. বছরের নির্দিষ্ট একটি তারিখ নির্ধারণ করে যাকাত না দিয়ে যখন খুশি দেয়া।

খ. এক বছরের যাকাত জমা করে রেখে পরে ধীরে ধীরে দেয়া।

গ. যাকাতের মাসায়ালা তথা বিধি-বিধান অনুসরণ না করা।

ঘ. বাপ-দাদার ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বার বার সামান্য পরিমাণে যাকাত দেয়া।

ঙ. রিলিফ আকারে সামান্য পরিমাণে যাকাত দেয়া-যেমন শাড়ি, লুঙ্গি বিতরণ।

চ. নাম-কাম তথা সুনাম অর্জনের জন্য বা নির্বাচনে ভোট পাওয়ার জন্য যাকাত বিতরণ করা।

ছ. যাকাত গ্রহীতার অগ্রাধিকার চাহিদা বিবেচনা না করে তাকে কিছু একটা চাপিয়ে দেয়া।

জ. অনেকে নিজ সঞ্চয়ের উপর যাকাত দিলেও ব্যবসার সম্পদের উপর যাকাত না দেয়া।

এভাবে দেয়ার ফলে যাকাতের কোন সুফল আমরা সমাজে লক্ষ্য করি না।

অপরদিকে, বাংলাদেশ সরকার যাকাত ব্যবস্থাপনার জন্য একটি যাকাত তহবিল গঠন করেছে এবং উক্ত যাকাত তহবিলে যে কেউ চাইলে স্বেচ্ছায় যাকাত দিতে পারে; কিন্তু আইন অনুযায়ী সেখানে যাকাত দেয়া বাধ্যতামূলক নয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, আইন করে যাকাত পরিশোধ বাধ্যতামূলক করা হলে সরকার বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর হাজার

হাজার কোটি টাকা যাকাত আদায় করতে পারে। আর এভাবে সংগৃহীত যাকাত তহবিল দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যয় করা যেতে পারে। দু :খজনক যে, সরকারি নীতি, পরিকল্পনা ও বাজেটে যাকাত বলে কোনো খাতের স্বীকৃতি নেই। একটি মুসলিম সমাজের জন্য এটা মোটেই কাঙ্ক্ষিত নয়।

অপরদিকে, বহু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা যাকাত গ্রহণ করে এতিমখানা, মাদ্রাসা, লিল্লাহ বোর্ডিং পরিচালনা করে থাকেন। আবার অনেকে ব্যক্তি পর্যায়ে নিজ আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশী গরিবদের যাকাত দিয়ে থাকেন। সন্দেহ নেই, এসব লোক সবার আগে যাকাত পেতে অগ্রাধিকার পাবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে-এভাবে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্তভাবে যাকাত বিতরণের ফলে জাতীয় পর্যায়ে এর আর্থ-সামাজিক প্রভাব অনুভূত হচ্ছে না। যাকাত আদায় ও বিতরণে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা না থাকায় এর সংগ্রহ ও বিতরণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব দেখা যায়। সবচেয়ে লক্ষণীয় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যাকাত দেয়া হয় স্বল্প পরিমাণে যা যাকাত গ্রহীতার জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ কোনো অবদান রাখতে পারে না। বড়জোর তার সাময়িক কষ্টের কিছুটা লাঘব হয়। কয়েকটি খাতে যাকাতের একটি শর্ত হচ্ছে— যাকাতের মালিকানা হস্তান্তর করতে হবে এবং যাকাত গ্রহীতাকে কোনো শর্ত আরোপ করা যাবে না। অনেকেই এসব বিষয়ের প্রতি নজর দেন না।

আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় যাকাত সম্পর্কে বিস্তারিত শিক্ষার সুযোগ রাখা হয়নি। বাজারে যাকাতের উপর মানসম্মত বই-পুস্তকও খুব বেশি পাওয়া যায় না। ফলে যাকাতের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ও অর্থনৈতিক ইনস্ট্রুমেন্ট সমাজের কল্যাণে ভালোভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

বাংলাদেশে যাকাত সংগ্রহের সুপ্ত সম্ভাবনা

জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। এদেশের মুসলমানদের ধর্মপরায়ণ হিসেবে গণ্য করা হয়। সুতরাং ধারণা করা যেতে পারে যে, মুসলিম জনগোষ্ঠীর অনেকেই যাকাত প্রদান করে

থাকেন। তবে কত ভাগ যাকাতদাতা যাকাত পরিশোধ করছেন এবং তার পরিমাণই বা কী তার কোনো পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। যেহেতু অধিকাংশই ব্যক্তি বা পারিবারিক পর্যায়ে বিচ্ছিন্নভাবে যাকাত প্রদান করে থাকেন, সেহেতু এর সঠিক পরিসংখ্যান নিরূপণ করাও সহজসাধ্য নয়। একমাত্র সরকারি উদ্যোগেই এর পরিসংখ্যান নিরূপণ করা যেতে পারে।

বেসরকারি পর্যায়ে বাংলাদেশে যাকাত সংগ্রহের সম্ভাবনা সম্পর্কে কিছু সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে। যেমন, যুক্তরাষ্ট্রের নিউ অরলিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. কবীর হাসান ও তার সহ-গবেষকেরা ২০০৫ সালে এরূপ একটি সমীক্ষা পরিচালনা করেন। তার গবেষণার ফল অনুযায়ী ২০০১ সালে বাংলাদেশে যাকাত সংগ্রহের সম্ভাবনা ছিল ২৫,০০০-৩০,০০০ কোটি টাকা। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতির যেমন অগ্রগতি হয়েছে, তেমনি ধনবান পরিবারের সংখ্যাও বেড়েছে। আবার এদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলিম। অপরদিকে, মুদ্রাস্ফীতির কারণে টাকার মূল্যমানও হ্রাস পেয়েছে। পাশাপাশি মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে যাকাত, দান-সাদাকাহ প্রদানের আগ্রহও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে ধারণা করা হয়। এরূপ প্রেক্ষাপটে ড. কবীর হাসানের নেতৃত্বে ২০২২ সালে একইভাবে আরেকটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ড. হাসানের উদ্যোগটি কোনো শুমারি (Census) ছিল না। তিনি সেকেন্ডারি উৎস থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে তার সমীক্ষাটি পরিচালনা করেন। বলাই বাহুল্য যে, সেকেন্ডারি উৎস-নির্ভর সমীক্ষাতে নানাবিধ সীমাবদ্ধতা থাকে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় রেখেই তাদের সমীক্ষা থেকে বাংলাদেশে যাকাত সংগ্রহের সম্ভাবনা সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ করা যেতে পারে। আরো উল্লেখ্য যে, একমাত্র সরকারি উদ্যোগে যাকাত সংগ্রহ করা হলেই সম্ভাবনার (Potential) সবটুকু আদায় করা সম্ভব। কবীর হাসান ও তার সহ-গবেষকের সমীক্ষা অনুযায়ী (২০২১ সাল) বাংলাদেশে যাকাত

সম্পদের সম্ভাবনা ছিল প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা। গবেষকরা বিভিন্ন খাতের যাকাত প্রাপ্তির যে, সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে; কৃষি, পশুসম্পদ, মৎস সম্পদ, ব্যাংক ডিপোজিট, শেয়ার ও বন্ড, পেনশন, খনিজসম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি। গবেষকরা ব্যক্তি পর্যায়ের স্বর্ণ-রৌপ্যের কোনো প্রকার হিসাব করেননি। বস্তুত এরূপ হিসাব পাওয়াও সহজ নয়।

উল্লেখিত আলোচনা থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশে যাকাত সংগ্রহের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। এতদসত্ত্বেও দেশের অর্থনীতিতে রাজস্ব উৎস হিসেবে যাকাতকে বিবেচনা করা হচ্ছে না। বিস্ময়কর হলো যে, একটি মুসলিম দেশে যাকাতের মতো প্রাচুর্যে ভরা সম্পদ সম্পর্কে আমাদের বাজেট, উন্নয়ন প্রকল্প, জাতীয় নীতিকৌশল, বার্ষিক পরিকল্পনা কোথাও এর উল্লেখ নেই। এমনকি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও যাকাতকে গুরুত্বের সাথে পড়ানো হয় না।

বাংলাদেশে যাকাতের আইনি কাঠামো :

১৯৮২ সালে বাংলাদেশ সরকার একটি অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ যাকাত বোর্ড গঠন করেন। উক্ত আইনের মাধ্যমে যাকাত আদায় বাধ্যতামূলক করা হয়নি; বরং স্বেচ্ছামূলকভিত্তিতে যাকাত বোর্ডে যাকাত প্রদানে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। যাকাত বোর্ডে যাকাত প্রদান করলে ১০% আয়কর রিবেট প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সরকার ২০২৩ সালে উক্ত আইনটির কিছু সংশোধন ও পরিমার্জন করে একটি নতুন যাকাত আইন (যাকাত তহবিল ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১৩) প্রণয়ন করেছে।

সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট

সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজিডএম) একটি দরিদ্র বান্ধব অলাভজনক সংস্থা যা ২০০৮ সালে সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট-এর আওতায় নিবন্ধিত। এ সংস্থার কাজ হচ্ছে যাকাত সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট

সবাইকে সচেতন করা এবং তাদেরকে সুষ্ঠুভাবে যাকাত বণ্টনে ব্যবস্থাপনা সহায়তা প্রদান করা। এর মাধ্যমে সিজেডএমকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করা যাতে যাকাত ব্যবস্থাপনায় সংস্থাটি পথিকৃতের ভূমিকা পলন করতে পারে।

সিজেডএম প্রধানত ঃ যাকাত নিয়ে কাজ করলেও সংস্থাটি ওয়াকফ, সাদাকা, অনুদান ইত্যাদি তহবিল ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও পালন করে থাকে। তারা সংগৃহীত তহবিল যে সব খাতে বিতরণ করে থাকে সেগুলো হচ্ছে : (১) ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি ও পরিবারগুলোকে বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান; (২) ক্ষুদ্র ব্যবসা বা উৎপাদনশীল কাজে মূলধন সরবরাহ; (৩) মানব উন্নয়ন তথা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, উন্নয়ন ও বিশুদ্ধ পানি, পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা প্রদান; এবং (৪) নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের মাধ্যমে সুনাগরিক তৈরির কাজে সহায়তা প্রদান।

উল্লেখিত খাতসমূহে যাকাতের অর্থ বিতরণ ও ব্যবহারের মাধ্যমে সিজেডএম যে লক্ষ্য অর্জন করতে চায় তাহলো : সমাজের যে সব ব্যক্তি বা পরিবার উৎপাদনশীল কাজ বা আয়বর্ধনমূলক কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য রাখে না তাদের বেঁচে থাকার জন্য সহায়তা করা। অপরদিকে, যারা কাজ করার সামর্থ্য ও সক্ষমতা রাখে তাদেরকে পুঁজি ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সহায়তা করা যাতে সে উপার্জন বৃদ্ধি করতে পারে। আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি ঐ পরিবারগুলোর সদস্যদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনের মাধ্যমে মানব উন্নয়ন সূচকগুলোতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা অন্যতম লক্ষ্য। এ ছাড়া সমাজে বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে শান্তিতে বসবাস করার জন্য ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের সর্ম্পক সৃষ্টি করা।

সিজেডএম-এর যাকাত ব্যবস্থাপনা নীতিকৌশল

ক. **দারিদ্র্যবিমোচন কৌশল :** বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনের বিভিন্ন মডেল দীর্ঘদিন ধরে চালু আছে। এর মধ্যে টেকসই মডেল কোন্‌টি তা বলা বেশ কঠিন। সিজেডএম যাকাতভিত্তিক দারিদ্র্যবিমোচন

কৌশল দাঁড় করানোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ইতোমধ্যে এ কৌশল সফল বলে প্রমাণিত হতে শুরু করেছে। আশা করা যায় এ মডেলকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব হবে।

খ. **সচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধকরণ :** যাকাতের সুপ্ত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের ভূমিকাকে কার্যকরভাবে তুলে ধরার লক্ষ্যে সিজেডএম জনগণকে সচেতন করোর জন্য অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। ওয়েবসাইট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, যাকাত ফেয়ার, সেমিনার ও আলোচনা সভা, পুস্তিকা প্রকাশ ও বিতরণ, গণমাধ্যমের ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি চালু রয়েছে।

গ. **যাকাত ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো :** সিজেডএম-এর মেমোরেন্ডাম অনুসারে সংস্থার একটি গভর্নিং বোর্ড রয়েছে। সংস্থার নীতি ও কর্মকৌশল নির্ধারণে বোর্ডই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। তবে উক্ত বোর্ডকে সহায়তার জন্য রয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ, শরীয়াহ বোর্ড, নিরীক্ষা কমিটি ইত্যাদি। একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার অধীনে একটি সাংগঠনিক কাঠামের আওতায় জনবল রয়েছে। এ ছাড়া প্রতিটি কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে ম্যানুয়েল।

ঘ. **ব্যবস্থাপনা পরিষেবা :** যাকাত দাতাদের অনেকেই যাকাত বিতরনে সমস্যার সম্মুখীন হন। যাকাত ক্যালকুলেশন, মাসায়ালা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া, উপযুক্ত যাকাতগ্রহীতা বাছাই, বিতরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, তত্ত্বাবধান ও মনিটরিং, উপযুক্ত ব্যবস্থাপক ও জনবল নিয়োগ, পর্যাপ্ত সময়দান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদান করা সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট-এর অন্যতম প্রধান কাজ। এ সংস্থা যাকাত প্রাপকদের বাছাই, সংগঠিতকরণ, যৌথ ব্যাংক হিসাব, যৌথ ব্যবসা, মনিটরিং ও তত্ত্বাবধান, প্রশিক্ষণ, সমন্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন, প্রকল্প গ্রহণে আধুনিক পদ্ধতি

অনুসরন, মূল্যায়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, আইনগত বৈধতা, গণতান্ত্রিক রীতি অনুসরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। যাকাতের মত অন্যতম একটি মৌলিক ইবাদাত ও আর্থ-সামাজিক বিষয়কে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়াই সিজেডএম-এর উদ্দেশ্য।

সিজেডএম যাকাত বণ্টন কর্মসূচি

ক. **ইনসানিয়াত কর্মসূচি :** উপার্জন করার সামর্থ্য নেই এমন ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি ও পরিবারকে জরুরি খাদ্য ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। এ কর্মসূচির আওতায় হতদরিদ্রদের জরুরি জটিল রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এদের মধ্যে রয়েছে বৃদ্ধ, পঙ্গু-প্রতিবন্ধী, এতিম, বিধবা ইত্যাদি অসহায় ও দুঃস্থ জনগোষ্ঠী। এ কর্মসূচির আওতায় শীতবস্ত্র বিতরণ, কুরবানির গোশত বিতরণও অন্যতম। এছাড়া বধির শিশুদের জন্য হিয়ারিং এইড, তালু ও ঠোঁট কাটা অপারেশন, চক্ষু অপারেশন ইত্যাদি সহায়তাও করা হয়।

খ. **জীবিকা উন্নয়ন কর্মসূচি :** এটি একটি আয় বৃদ্ধি ও মানব উন্নয়ন সম্পৃক্ত কর্মসূচি। এর আওতায় দরিদ্রদের সংগঠিত করে তৃণমূল সংগঠন গড়ে তোলা হয় এবং তাদের যৌথ ব্যাংক হিসাব প্রতি পরিবারকে ২০,০০০ থেকে ৩০,০০০ টাকা করে মূলধন হস্তান্তর করা হয়। দলগত ব্যাংক হিসাবের ৬.০০-৭০.০০ লক্ষ টাকা ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে ব্যবহার করে সদস্যরা তা আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে বিনিয়োগ করে। গৃহীত মূলধনের সমপরিমাণ তারা তাদের তহবিলেই ফেরত দেয়। মুনাফার সিংহভাগ তারা পরিবারের জন্য ব্যয় করে এবং অবশিষ্ট সঞ্চয় করতে পারে। সদস্যদের বিনিয়োগ ব্যবহারে দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ও তদারকি করা হয়। এদের মধ্যে যারা অধিকতর দক্ষতার পরিচয় দিতে পারে তাদেরকে 'মুদারিব' কর্মসূচি তথা ক্ষুদ্র ও

মাইক্রো উদ্যোক্তা হিসেবে উন্নীত করার জন্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

গ. **ফেরদৌসি স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি** : বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা এখনো পিছিয়ে রয়েছে। বিশেষত ঃ পল্লী এলাকার দরিদ্র নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা ঠিকমত পায় না, তাদের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য সিজেডএম 'ফেরদৌসি' স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এর আওতায় একটি কেন্দ্রে স্থায়ী প্যারামেডিক এবং সপ্তাহান্তে এমবিবিএস ডাক্তার চিকিৎসা পরামর্শ প্রদান করে থাকে। প্রতি কেন্দ্রের পরিমণ্ডলে ন্যূনতম ৫০০টি দরিদ্র পরিবারকে বিনামুল্যে চিকিৎসা সুবিধার জন্য 'হেলথ-কার্ড' দেয়া হয়। গর্ভবর্তী ও দুগ্ধবতী মায়েদের জন্য বিশেষ সেবা প্রদান করা হয়। কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এসব পরিবারে স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। এয়াড়া রেফারেল ব্যবস্থার আওতায় জটিল রোগের চিকিৎসা সহায়তা করা হয়।

ঘ. **গুলবাগিচা শিক্ষা ও পুষ্টি কর্মসূচি :** দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিশুরা একদিকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করে। অপরদিকে, তারা পুষ্টিহীনতায় ভুগে এবং প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। এজন্য সিজেডএম এসব শিশুদের জন্য প্রাক প্রাথমিক ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য এক বছর মেয়াদি শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। প্রতিটি গুলবাগিচা কেন্দ্রে ২৫ জন শিশু শিক্ষা লাভ করে থাকে। তাদের পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য সপ্তাহে ৬ দিন পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার সরবরাহ করা হয়। তাদের বইপত্র ও শিক্ষার অন্যান্য উপকরণ ও পোশাক প্রদান করা হয়। সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সিজেডএম বেশ কয়েকটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক (আবাসিক) বিদ্যালয় পরিচালনা করছে।

ঙ. **জিনিয়াস বৃত্তি কর্মসূচি :** পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজে স্নাতক শ্রেণিতে অধ্যয়নরত সুবিধাবঞ্চিত ছাত্র-ছাত্রীদের মাথাপিছু মাসিক ৪০০০ টাকা (২০২২ সাল) হারে বৃত্তি প্রদান করে সুষ্ঠু লেখাপড়ায় সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়া এসব শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি এবং নৈতিকতা উন্নয়ন ও প্রতিযোগিতামূলক চাকরি বাজারে অধিকতর সক্ষম করে তোলার জন্য প্রতি মাসে লেকচার সেশনে যোগ দিতে হয়।

চ. **নৈপুণ্য বিকাশ কর্মসূচি :** সমাজে দারিদ্র্যের কারনে অনেক শিক্ষার্থী মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে গমন করতে পারে না। অথচ তারা অদক্ষতার কারণে বেকার বা অর্ধ-বেকারে পরিণত হয়। এদেরকে কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে চাকরি অথবা আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়ার জন্য সিজেডএম এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

ছ. **দাওয়াহ কর্মসূচি :** বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণকে যাকাত ও নৈতিক আধ্যাত্মিক চরিত্র বিকাশে এবং ভ্রাতৃত্ববোধে উজ্জীবিত একটি সমাজ গঠনে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

চতুর্থ অধ্যায়
দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী নীতি-কৌশল

সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য

আজকের বিশ্বে মানব সভ্যতা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রগতি সাধন করেছে। এর ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন জাতি-রাষ্ট্র ব্যাপক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। অনেকের জীবনযাত্রার মান বেড়েছে। অপরদিকে, দুঃখজনকভাবে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ দারিদ্র্য, অশিক্ষা, স্বাস্থ্যহীনতা ও আশ্রয়ের অভাবে অতি দুঃখ-কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। বলাই বাহুল্য, সম্পদ বন্টনে বৈষম্য ও শোষন প্রক্রিয়ার নির্মম যাতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে এসব আদম সন্তান বিপন্ন অবস্থায় দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। মানবতার এ দুরাবস্থা ইতিহাসে একেবারে নতুন কিছু নয়; যুগে যুগে দেশে দেশে বিভিন্ন মতাদর্শের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হলেও আজও বিশ্বে বঞ্চিত ও হতভাগ্য মানুষের সংখ্যা কম নয়; বরং বেড়েই চলেছে। বিশ্বব্যাপী সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য ও শোষণ প্রক্রিয়া যে কী ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। বর্তমান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলে যে আয় সঞ্চারিত হচ্ছে তার দুই-তৃতীয়াংশ চলে যাচ্ছে মাত্র ২০% ভাগ ধনী লোকের হাতে। পক্ষান্তরে, ২০% ভাগ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগে জোটে মাত্র ৫% ভাগ উপার্জন। বিশ্বের ৪০ কোটি মানুষের দৈনিক মাথাপিছু আয় মাত্র ১ ডলার বা বাংলাদেশি ১০০ টাকারও কম। সার্বিকভাবে দুনিয়ার ৮০% ভাগ মানুষের দৈনিক মাথাপিছু গড় আয় মাত্র ১০ ডলার।

দারিদ্র্যের এই ব্যাপকতার ফলশ্রুতিতে মানব সমাজে দুঃখ আর হতাশা অত্যন্ত করুণ আকার ধারন করেছে। ইউনিসেফের দেয়া তথ্য অনুসারে, দারিদ্র্যের কারণে বিশ্বে প্রতিদিন ২৫ হাজার শিশু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। প্রধানত ঃ প্রত্যন্ত এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অবহেলিত গ্রামাঞ্চলেই শিশুরা অকালে হারিয়ে যাচ্ছে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এসব

এলাকার করুণ চিত্র অনেকেরই জানা নেই। উন্নয়নশীল দেশগুলোর ২৯% ভাগ শিশু অপুষ্টি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং এদের বেশীর ভাগই আবার দক্ষিণ-এশিয়া ও আফ্রিকার সাহারা অঞ্চলে বাস করে। একবিংশ শতকের যাত্রালগ্নে বিশ্বের প্রায় ১০০ কোটি মানুষ অশিক্ষিত অর্থাৎ এরা বই পড়তে বা নাম স্বাক্ষর করতে জানে না। কোটি কোটি শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত যাওয়ার আগেই অনিশ্চয়তার অন্ধকারে হারিয়ে যায়। অপরদিকে, ১০০ কোটিরও বেশি মানুষ বিশুদ্ধ পানি থেকে বঞ্চিত এবং ২৫০ কোটি মানুষ স্যানিটেশন সুবিধা পায় না। প্রতি বছর ২০ লক্ষ শিশু ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। বিশ্বে শিশুর সংখ্যা প্রায় ২০০ কোটি; এর মধ্যে প্রায় অর্ধেক দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। এদের ৬৫ কোটিরই নির্দিষ্ট বাসগৃহ নেই। প্রায় ২৭ কোটি শিশু প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুবিধা পায় না। ধনী-গরিবের এই বৈষম্য দিনদিন বেড়েই চলছে। বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যা ৬৫০ কোটির মত। এর মধ্যে মাত্র ১০০ কোটি লোক বাস করে ধনী দেশগুলোতে। অথচ এদের কাছে রয়েছে বার্ষিক মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৭৬% ভাগ সম্পদ। পক্ষান্তরে স্বল্প আয়ের দেশগুলোতে বসবাসকারী ২৫০ কোটি জনগোষ্ঠীর বিশ্বের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের হিস্যা মাত্র ৩.৩% ভাগ। ১৮২০ সালে ধনী ও গরিব দেশগুলোর মধ্যে সম্পদের তুলনামূলক অনুপাত ছিল ৩ :১। অথচ ১৯৯২ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭২ :১-এ। (অনুপ সাহা)

দারিদ্র্যের স্বরূপ

দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য দারিদ্র্যের সংজ্ঞা, এর পরিধির ব্যাপকতা এবং সেগুলো নিরসনের উপায় চিহ্নিত করার কাজটি সকলেই কমবেশি করে থাকেন। তবে এ ক্ষেত্রে চিন্তা ও বিশ্লেষণের পার্থক্য লক্ষণীয়। সাধারণত : মনে করা হয় যে, ক্ষুধা, অসুস্থতা, অপুষ্টি, শারীরিক ও মানসিক বিষণ্নতা দারিদ্র্যের লক্ষণ। কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি এর সাথে মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংকটকেও যোগ করেছেন। সুনির্দিষ্টভাবে ধরে নেয়া হয় যে, মাথাপিছু আয় এক বা দুই ডলার যা দিয়ে মৌলিক চাহিদা পূরণ করা যায় না, সেটাই দারিদ্র্য। এক কথায়, এমন অর্থনৈতিক অবস্থা যা

দিয়ে জীবন-জীবিকার ন্যূনতম চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় না তা দারিদ্র্য বলে বিবেচিত।

জাতিসংঘের মতে, মানবিক চাহিদা পূরণে সেই দুরাবস্থাই দারিদ্র্য যাতে মানুষের মৌলিক চাহিদা তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, বিশুদ্ধ পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও তথ্য-প্রযুক্তির চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয় না।

বিশ্বব্যাংকের দৃষ্টিতে দারিদ্র্য হচ্ছে- নিম্নমাত্রার আয় এবং মৌলিক ভোগ্যপণ্য ও সেবা অর্জনে অক্ষমতা। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত "দারিদ্র্যবিমোচন কৌশলপত্র" (২০০৫) দারিদ্র্যের ব্যাপক সংজ্ঞা দিয়ে বলেছে, দারিদ্র্যকে মোকাবেলা করতে হবে বহুমুখী হস্তক্ষেপের মাধ্যমে। (The poverty is multidimensional, and the battle against poverty has to be waged on many fronts and with unrecruitting).

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, দারিদ্র্যের অবসানে যে সব বিষয় আলোচনা হয় বলতে গেলে তার কোনটিতেই সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শোষণ প্রক্রিয়া নিরসনের এবং সম্পদ পুনঃবণ্টনের কোনো উপায় নির্দেশ করা হয়নি। এ ছাড়া, মানুষের মননশীলতা ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নেরও কোনো কথা বলা হয়নি। মানুষ তো শুধুমাত্র জৈবিক প্রাণী নয়-তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের সুযোগ না থাকলে প্রকৃত প্রশান্তি লাভ করতে পারে না।

ইসলাম হচ্ছে একটি বিশ্বজনীন পূর্ণাঙ্গ ঐশী জীবন ব্যবস্থা। সুতরাং দেখা যাক, ইসলাম দারিদ্র্যকে কীভাবে বিবেচনা করে। ইসলামের দৃষ্টিতে দারিদ্র্যের পরিধি শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক চাহিদা পর্যন্ত সম্প্রসারিত। মহানবী (সা.) বলেছেন : প্রকৃত ধনী সেই ব্যক্তি যিনি মনের দিক থেকে ধনী। এ হাদিস থেকে বুঝা যায়, শুধুমাত্র সম্পদের অভাবই দারিদ্র্য নয়। মনোজগত তথা নৈতিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও আধ্যাত্মিকতার সাথেও দারিদ্র্যের সম্পর্ক রয়েছে।

ইমাম আল গাজালী বলেছেন যে, ইসলামী শরীয়াহর উদ্দেশ্য (মাকাসিদ আল শরীয়াহ) হচ্ছে জনগণের কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে তাদের আকিদা বিশ্বাস, জীবন, বুদ্ধিবৃত্তি, সন্তান-সন্ততি ও সম্পদের সংরক্ষণ করা এবং

যা কিছু এই পাঁচটি বিষয়ের নিশ্চয়তা বিধান করে তা-ই জনস্বার্থ বলে গণ্য এবং সেটাই কাম্য।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম বলেছেন, শরীয়াহর ভিত্তি হচ্ছে মানুষের প্রজ্ঞা এবং পার্থিব ও পরকালীন জীবনের কল্যাণসাধন। আর কল্যাণ নিহিত রয়েছে ন্যায়-বিচার, দয়া, সুখ-সমৃদ্ধি ও প্রজ্ঞার মধ্যে।

ইমাম শাতিবী মানবীয় চাহিদাকে তিনভাগে ভাগ করেছেন : (ক) বেঁচে থাকার জন্য যা জরুরি (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা); (খ) উন্নয়ন চাহিদা (যাতায়াত সুবিধা, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, ফ্যান ইত্যাদি); (গ) নান্দনিক চাহিদা বা সৌন্দর্যমণ্ডিতকরন (শিল্পকর্ম, কার্পেট, ফুলদানী)।

ইউসুফ আল কারযাভী দারিদ্র্যকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন : (ক) এমন দরিদ্র যার কর্মদক্ষতা ও সামর্থ্য আছে, কিন্তু তার মূলধন নেই; (খ) এমন ব্যক্তি যিনি শারীরিক বা মানসিকভাবে কাজ করার যোগ্যতা রাখেন না। সুতরাং প্রথম শ্রেণিকে পুঁজি দেয়া এবং দ্বিতীয় শ্রেণিকে বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করা উচিত।

প্রফেসর উমর চাপরা আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন এবং ভ্রাতৃত্ববোধ ও আর্থ-সামাজিক সুবিচারের জন্য 'নৈতিক পরিশোধন' (Moral filter) পদ্ধতি প্রবর্তনের উপর জোর দিয়েছেন। তিনি মানব সমাজের উন্নয়নের ক্ষেত্রে 'মাকাসিদ আল শরীয়াহ'-কে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি মনে করেন যে, সব সমাজেরই স্বীকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব কল্যাণ। অবশ্য কল্যাণের মৌলিক উপাদান কী এবং তা কীভাবে অর্জিত হবে সে সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। যদিও একমাত্র বস্তুগত অবস্থাই কল্যানের উপাদান নয়; তথাপি আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ ধারণায় প্রাথমিকভাবে ঐ সব বিষয়ের উপর জোর দিয়ে বলা হয় যে, কতিপয় বস্তুগত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন না হওয়া পর্যন্ত কল্যাণ বা সুখ-সমৃদ্ধি নিশ্চিত হয় না। এসব লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে : দারিদ্র্য দূরীকরণ, ব্যক্তির বস্তুগত মৌলিক চাহিদা পূরণ, সৎ উপায়ে জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রত্যেকের সুযোগের লভ্যতা এবং আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা। অবশ্য বিশ্বের

ধনী গরিব নির্বিশেষে এমন কোনো দেশ নেই যে দেশে এসব বস্তুগত লক্ষ্য পুরোপুরি অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

বাকির আল সদর মনে করেন যে, অষম বণ্টন এবং ধনী-দরিদ্রের মধ্যে মানবীয় সম্পর্ক রক্ষার নৈতিক কাঠামোর অনুপস্থিতির ফলেই দারিদ্র্য ও বঞ্চনার সৃষ্টি হয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী নীতি-কৌশল

দারিদ্র বিমোচনে যাকাতের কার্যকরতা সম্পর্কে উপলব্ধি করতে হলে ইসলামের কতকগুলো মৌলিক নীতিকে সর্বাগ্রে বুঝে নিতে হবে। 'আল্লাহর খলিফা' (প্রতিনিধি) হিসেবে প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব হচ্ছে পারিবারিক মর্যাদা ও ভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তিতে একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ গড়ে তোলা, সেখানে প্রত্যেকে সামর্থ্য অনুযায়ী জীবিকা উপার্জন করবে এবং যারা অসমর্থ তাদের দেখাশুনা করা সকলের সামষ্টিক দায়িত্ব। মহানবী (সা.) বলেছেন, "সে ব্যক্তি প্রকৃত মুসলমান নয় যে তার প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজের উদরপূর্তি করে" (তাবারানী, বায়হাকী)। হযরত আলী (রা.) বলেছেন, "গরিবদের জন্য যা পর্যাপ্ত প্রয়োজন তা তাদেরকে প্রদান করা ধনীদের উপর আল্লাহ বাধ্যতামূলক করেছেন। যদি গরিবরা অভুক্ত থাকে বা বস্ত্রহীন থাকে বা কষ্টভোগ করে, তার কারণ ধনীরা তাদের বঞ্চিত করে। এমতবস্থায় মহামহিম আল্লাহর জন্য এটাই যথোপযুক্ত যে, তিনি এদের হিসাব নিবেন এবং শাস্তি প্রদান করবেন"।

প্রফেসর উমর চাপরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, 'যাকাত হচ্ছে এমন পূর্ণ ধর্মীয় আঙ্গিকে একটি সামাজিক আত্ম-সহযোগিতার ব্যবস্থা যাতে রাষ্ট্রীয় কর্মসূচির পরও যারা নিজেদের সাহায্য করতে পারে না, সেরূপ গরিব ও দুঃস্থদের সাহায্য করা যাতে মুসলিম সমাজ থেকে দারিদ্র্য ও কৃপণতা দূর হয়। যদি যাকাত আদায়ের পরিমাণ গরিবের চাহিদা পূরনের জন্য যথেষ্ট না হয় তা হলে সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্য উপায় বের করা।

ইবনে হাযম আল জাহির মনে করেন যে, প্রতিটি দেশের ধনীদের কর্তব্য হচ্ছে দরিদ্রদের চাহিদা পূর্ণ করা এবং যাকাত যদি এ উদ্দেশ্য পূরণে যথেষ্ট না হয় তাহলে শাসকের কর্তব্য হলো দরিদ্রের খাদ্যের চাহিদা পূরণ করা, শীত ও গ্রীষ্মে বস্ত্র প্রদান করা এবং রৌদ্র, তাপ ও বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। এ ছাড়া তাদেরকে অনুকূল পরিবেশ প্রদান করা।

উমর চাপরা আরো বলেন যে, যেহেতু একজন মুসলমানের দায়িত্ব হচ্ছে নিজের উপার্জন নিজে করা সেহেতু এটাই সমীচীন হবে যে, যাকাত এমনভাবে বিতরণ করতে হবে যাতে দরিদ্ররা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। যাকাত হচ্ছে তাদের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা যারা নিজেদের প্রচেষ্টায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম নয়। অন্যদের জন্য যাকাত হবে একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা যা দ্বারা তাদেরকে পর্যাপ্ত উপার্জনের জন্য মূলধন, প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি ও উপকরণ সরবরাহ করা হবে। আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বিকাশের উৎসাহ দিতে হবে, যার মাধ্যমে লোকেরা নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য যাকাতকে ব্যবহার করবে। এভাবে মুসলিম দেশগুলোতে বিরাজমান বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাসে যাকাত কার্যক্ষম না হওয়ার কোন কারণ নেই।

ইমাম হাসান আল বান্না ইসলামী সমাজের অর্থনৈতিক সংস্কার প্রসঙ্গে কুটির শিল্পকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করেন যে, কুটির শিল্প দরিদ্র পরিবারগুলোর সব সদস্যের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে এবং বেকারত্ব ও দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক হবে।

বিশিষ্ট ইসলামী অর্থনীতিবিদ প্রফেসর উমর চাপরা বলেন, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের উন্নয়নের পথে অর্থসংস্থান করতে না পারাটাই প্রধান সংকট। গরিব মানুষ এজন্য গরিব নয় যে, তারা তাদের পরিশ্রমে অনাগ্রহী বা তাদের দক্ষতার অভাব রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, তারা ধনীদের চেয়ে বেশী পরিশ্রম করে। কিন্তু তারা তাদের দক্ষতার পূর্ণ ব্যবহার করতে পারে না। তাদের প্রধান সমস্যাই হচ্ছে, আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য তাদের মূলধন নেই। যারা মজুরিভিত্তিক চাকরি করে তাদের

ক্ষেত্রেও এটা বাস্তব যে, তারা চাকরিতে তাদের দক্ষতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারে না। তাদের মজুরির পরিমাণও এমন যে বিনিয়োগের জন্য সঞ্চয় দূরে থাকুক, তারা পরিবারের ন্যুনতম চাহিদাও পূরণ করতে পারে না। প্রফেসর ইউনুস এ প্রসঙ্গে বলেছেন, আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারনের প্রয়োজনীয় অর্থ ও সম্পদ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা হচ্ছে সর্বপ্রথম মৌলিক অধিকার যা অন্যান্য মানবাধিকার অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ড. মুহাম্মদ ইউনূস আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য 'অর্থ ও সম্পদ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা' বুঝাতে ক্ষুদ্র ঋণকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু যাকাত হতে পারে তাঁর উল্লেখিত 'অর্থ ও সম্পদ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা'-র সবচেয়ে কার্যকর উৎস যেটি তিনি উল্লেখ করেননি।

ইসলামী অর্থনীতিবিদরা আত্ম-কর্মসংস্থান তথা ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশে যাকাত থেকে মূলধন সরবরাহের পরামর্শ দিয়েছেন। যাকাত তহবিল এ উদ্দেশ্যে যথেষ্ট না হলে সাদাকাহ, ওয়াকফ থেকেও অর্থায়ন করা যেতে পারে। তৃতীয় ধাপেই কেবল সুদবিহীন ক্ষুদ্র ঋণের (Islamic Microfinance) কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

ড. কবীর হাসান দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য নান্দনিক প্রত্যয় (Holistic approch) নিয়ে কতকগুলো পদক্ষেপের কথা বলেছেন : (ক) সম্পদের সুষম বণ্টন ব্যবস্থা; (খ) দরিদ্র বান্ধব কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের আয় বৃদ্ধি করা; (সা.) সমাজের সবকে সমান সুযোগ দেয়া। এসব পদক্ষেপ বাস্তবায়নের জন্য ইতিবাচক (Positive), প্রতিকারমূলক (Preventive) ও সংশোধনমূলক (Corrective) কৌশলগ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন। ইতিবাচক কৌশল হচ্ছে : আয় প্রবৃদ্ধি, আয় বন্টন ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করা। প্রতিকারমূলক কৌশল হচ্ছে : সম্পদের মালিকানার উপর নিয়ন্ত্রন এবং অবৈধ কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রন। আর সংশোধনমূলক কৌশল হচ্ছে: সম্পদের বাধ্যতামূলক হস্তান্তর (যাকাত), পরামর্শমূলক হস্তান্তর (সাদাকাহ) ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব (নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা পূরণ)।

কবীর হাসান যে ইতিবাচক, প্রতিকারমূলক ও সংশোধনমূলক কৌশলের উল্লেখ করেছেন তার বাস্তবায়ন কাজটি প্রধানত সরকারী উদ্যোগ ছাড়া সম্ভব নয়। শুধুমাত্র সংশোধনমূলক কৌশল তথা যাকাতের মত সম্পদের বাধ্যতামূলক হস্তান্তর এবং সাদাকাহ ও ওয়াকফের মত স্বেচ্ছামূলক হস্তান্তরের কাজটি ব্যক্তি ও বেসরকারী উদ্যোগে সম্পাদিত হতে পারে।

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক পর্যায়ের কতকগুলো পদক্ষেপের সুপারিশ করেছে[১১]। এর অন্যতম হচ্ছে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং আয় ও সুযোগের সুষম বণ্টনের জন্য সামষ্টিক পর্যায়ে নীতিসংক্রান্ত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা। আইডিবি মনে করে, ব্যষ্টিক পর্যায়ে উৎপাদন সক্ষম পরিবার (Productive household) এবং উৎপাদন অক্ষম পরিবারগুলোর (Non-productive household) জন্য উপযুক্ত কৌশল গ্রহণ করতে হবে। আইডিবি মনে করে যে, সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা ও দারিদ্র্য হ্রাস করার লক্ষ্যে সরকারকেই পদক্ষেপ নিতে হবে এবং সম্পদ ও সুযোগ সুষমভাবে বণ্টনের জন্য নীতিগত সংস্কার সাধন করতে হবে। বিশ্বব্যাংকের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আইডিবির এই দৃষ্টিভঙ্গির সাযুজ্য রয়েছে। অপরদিকে ইউএনডিপি পরামর্শ দিয়েছে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, বিশুদ্ধ পানি, পয়ঃনিষ্কাসন, ভূমি, পুঁজি, দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদিকে জোরদার করার জন্য।

অত্র নিবন্ধে সামষ্টিকের চেয়ে ব্যষ্টিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্য বিমোচনের নীতি ও কর্মকৌশল সম্পর্কে প্রধানত ঃ আলোকপাত করা হবে। আমরা যেহেতু বেসরকারি উদ্যোগ নিয়ে কথা বলতে চাই সে বিবেচনায় আইডিবি'র ব্যষ্টিক পর্যায়ের সুপারিশগুলো আলোচনা করা যেতে পারে। তাদের মতে দারিদ্র্যবিমোচন কর্মসূচিকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় :

ক. ব্যবসামুখী সুবিধা প্রদান : আর্থিক মূলধন প্রদান করা যাতে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় তথা ব্যবসা করে উপার্জন করা যায়।

খ. উৎপাদনমুখী সুবিধা প্রদান : যে সব লোকের বিশেষ কর্মদক্ষতা ও নৈপুণ্য রয়েছে তাদেরকে মূলধন প্রদান করা যাতে তারা পণ্য বা সেবা উৎপাদন করতে পারে।

গ. নিজস্ব শ্রম ব্যবহারের সুবিধা : যে নিজ শ্রম দক্ষতা অন্যের কাছে বিক্রি করে উপার্জন করতে পারে।

আইডিবি'র মতে, ব্যষ্টিক প্রেক্ষাপটে দারিদ্রের মূল কারণ হচ্ছে ব্যক্তি বা পরিবারের মানবীয়, শারীরিক ও আর্থিক সক্ষমতার (Capital) অভাব। সুতরাং দারিদ্র্য বিমোচনে এমন পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে কার্যকরভাবে মূলধন স্থানান্তরিত হয়। এর সুফল হল, প্রথমত, তাদের কাছে সম্পদ হস্তান্তরিত হলে উৎপাদনমুখী পরিবারগুলো তাদের উপার্জন বৃদ্ধি ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে (Capacity Building) সক্ষম হবে। দ্বিতীয়ত, অ-উৎপাদনমুখী পরিবারগুলো যাতে রয়েছে শিশু, বিধবা, অতিশয় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রতিবন্ধী, অসুস্থ তাদেরকে সম্পদ হস্তান্তর করা অথবা সামাজিক নিরাপত্তা (Social Security) কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা।

বাংলদেশসহ বহু মুসলিম দেশেই সামষ্টিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে যাকাত ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রের ভূমিকা এখনও খুবই সীমিত বিধায় যাকাত ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ব্যষ্টিক পর্যায়ে দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে; বিশেষ করে ব্যক্তি বা পরিবারকে মূলধনের মালিক করে দেয়া। তাদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা, বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও সামাজিক সেবা দিয়ে সহযোগিতা করা যায়। যাকাতের মাধ্যমে আর্থিক সুবিধা প্রদানের খাতগুলো সুনির্দিষ্ট বিধায় বৃহত্তর পরিধিতে মানবিক কল্যাণ সাধনে সাদাকাহ ও ওয়াকফ কার্যকর অবদান রাখতে পারে। মুসলিম স্কলারবৃন্দ ও ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের অভিমতগুলো বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে যাকাতের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে নিম্নলিখিত সাধারণ কৌশলগুলো চিহ্নিত করা যায় :

১. কেবলমাত্র সম্পদের চাহিদা নয়, মানুষের নৈতিক, মনোজাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নেরও ব্যবস্থা করা;

২. দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যক্তি ও পরিবারের সার্বিক কল্যাণে সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ;

৩. মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান;

৪. দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির জন্য মূলধন হস্তান্তর করা;

৫. 'অ-উৎপাদনমুখী' ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি বা পরিবারকে সরাসরি আর্থিক সহায়তা বা সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ে নিয়ে আসা;

৬. রাষ্ট্রীয় সমান সুযোগ-সুবিধার যে লভ্যতা রয়েছে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সেখানে অভিগম্যতা (Access) সহজ করা;

৭. উৎপাদনমুখী ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য মূলধন ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সহায়তা করা;

৮. দক্ষ শ্রমিক তৈরি করে তাদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;

৯. দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের লক্ষ্যে টেকসই কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

১০. মুসলিম জীবনে ঐক্যবদ্ধ থেকে কাজ করার নীতি অনুসরণ।

উল্লেখিত আলোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, প্রচলিত দারিদ্র্যবিমোচন কর্মসূচির সাথে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, প্রচলিত উন্নয়ন ধারণায় 'নৈতিক ও আধ্যাত্মিক' বিষয়টিকে উপেক্ষা করা হয়েছে; যার ফলে সার্বিক মানব কল্যাণের বিবেচনায় একটি শূন্যতা (Gap) রয়ে গেছে। অপরদিকে, টেকসই উন্নয়নের প্রশ্নেও প্রচলিত ধারণাগুলোতে মানবজীবনের ইহলৌকিক ও পরলৌকিক দিকগুলোতে সমানভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাসী একজন ব্যক্তির সার্বিক কর্মকাণ্ডে তার একটি দৃষ্টিভঙ্গিগত প্রতিফলন ঘটে থাকে। এছাড়া সম্পদ ও আয়ের সুষম বন্টনের ক্ষেত্রে যাকাত ও সাদাকাহ যেভাবে হস্তান্তরিত করা সুস্পষ্টভাবে নিশ্চিত হয় প্রচলিত কোনো অর্থব্যবস্থায় সেভাবে নিশ্চিত হয় না।

আবার সরকারি ও বেসরকারি অনেক সংস্থা যারা দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কাজ করে, অধিকাংশক্ষেত্রেই তাদের কর্মসূচি বা প্রকল্প বহুমূখী ও সমন্বিত নয়। তারা বিশেষ কোনো একটি বা দু'টি বড় খাতের জন্য কাজ করে, যেমন- ক্ষুদ্রঋণ বা স্বাস্থ্যসেবা। পক্ষান্তরে, যাকাত ও সাদাকাহ মানুষের বহুমুখী সমস্যাগুলোকে সমন্বিতভাবে দূর করার উদ্যোগ নেয়। অবশ্য বাংলাদেশে প্রচলিত যে পদ্ধতিতে যাকাত বিতরণ করা হয় তার মাধ্যমে যাকাতকে দারিদ্র্য বিমোচনের কার্যকর আর্থিক 'টুল' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন যাকাতের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা।

দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত

ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মহানবী (সা.) মদিনায় একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর সেখানে যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তিনি যাকাত আদায় ও তা বিতরণের জন্য কর্মচারি নিয়োগ করতেন। যাকাতের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার ফলশ্রুতিতে সেখানে সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তা কিছু সম্পদশালী লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সমাজের পিছিয়ে পড়া অভাবগ্রস্তদের মধ্যেও বণ্টিত ও আবর্তিত হতে থাকে। খোলাফায়ে রাশেদিনের সময়ে হযরত আবু বকর (রা.) রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা জোরদার করেন। হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে মুসলিম উম্মাহর অর্থনৈতিক অবস্থার এতটা উন্নতি হয়েছিল যে, যাকাতের সম্পদ বিতরণের জন্য প্রাপক (মুস্তাহিক) পাওয়া যাচ্ছিল না। ইয়েমেনের গভর্নর সংগৃহীত যাকাত সম্পদ মদিনাতে পাঠাতে চাইলে খলিফা তাকে তা সেখানেই বিতরণের নির্দেশ দেন। কিন্তু গভর্নর জানান যে, ইয়েমেন যাকাতের সম্পদ বিতরণের জন্য প্রাপক পাওয়া যাচ্ছে না। একইভাবে উমর ইবনে আবদুল আজিযের সময়ে মিসরের গভর্নর জানান যে, সেখানে যাকাতের সম্পদ বিতরণের জন্য উপযুক্ত প্রাপক নেই। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যাকাত দারিদ্র্য বিমোচনে বিরাট অবদান রাখতে পারে এবং ইসলামের ইতিহাসে তার নজির রয়েছে। যাকাতের পাশাপাশি উশর, ওয়াকফ, ফিতর, সাদাকাহ, কর্জে হাসানা ইত্যাদি ব্যবস্থাও ইসলামী সমাজে অর্থনৈতিক

বৈষম্য দূরীকরণে বিশেষ অবদান রাখে। ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা ছিল একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত স্বর্ণালী সম্পদ।

খোলাফায়ে রাশেদিনের পরে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ইসলামী নীতির ব্যত্যয় ঘটলেও উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলেও যাকাত আদায় ও বিতরণ ব্যবস্থাপনা রাষ্ট্রীয়ভাবে করা হতো। খিলাফত ব্যবস্থার পতন ও ঔপনিবেশিক শাসনের ফলশ্রুতিতে মুসলিম বিশ্বে রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত ব্যবস্থাপনার অবসান ঘটে। ঔপনিবেশিক শাসনে পুঁজিবাদের ভয়াল আগ্রাসন মুসলিম সমাজকে একেবারে পঙ্গু করে দেয়। ঔপনিবেশিক শাসনের কবল থেকে মুক্তির পর সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের এরূপ সুন্দর ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও আজ মুসলিম সমাজে এর অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমরা যেন সেই 'ঐতিহ্যবাহী স্বর্ণালী সম্পদ' হারিয়ে ফেলেছি। আমরা এখন 'সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য' পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞদের কাছে উপদেশ খুঁজে বেড়াচ্ছি। এখন বিভিন্ন দাতা দেশ ও সংস্থাগুলো বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও দারিদ্র্যবিমোচন কৌশলপত্র প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পরামর্শ ও চাপ দিচ্ছে। অনেক মুসলিম দেশের সরকার রাজস্ব তহবিলে সম্পদের ঘাটতি মোকাবিলায় হিমশিম খাচ্ছে। আজকে হাতে গোনা কয়েকটি দেশ বাদ দিলে অধিকাংশ মুসলিম দেশের সরকারের অর্থনৈতিক পলিসি ডকুমেন্টে যাকাত আর্থিক ও রাজস্ব খাত হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে না। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য তারা বিদেশের কাছে অনুদান ও ঋণের জন্য ধরনা দিচ্ছে; অথচ যাকাতের মতো লুকায়িত বিশাল সম্পদের দিকে নজর দিচ্ছে না। দুঃখজনক যে, অধিকাংশ মুসলিম দেশেই আল্লাহ নির্দেশিত বাধ্যতামূলক এই ইবাদাতটি রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিপালন করা হচ্ছে না।

দারিদ্র্য বিমোচনে মহানবী (সা.)-এর কৌশল

হাদিসে বর্ণিত মহানবী (সা.)-এর বিখ্যাত একটি ঘটনা দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল হিসেবে অনন্য ও যুগান্তকারী বলে গণ্য করা যেতে পারে। সহিহ আল বুখারীর সূত্রে জানা যায়, একদিন এক ভিক্ষুক এসে রাসূল (সা.)-এর কাছে ভিক্ষা চাইল। রাসূল (সা.) তাকে ভিক্ষা না দিয়ে তাকে জিজ্ঞসা করলেন, তোমার ঘরে কী কিছু নেই? সে জবাব

দিলো : একটি কম্বল ও একটি পানির পাত্র আছে। তিনি তাকে সেগুলো নিয়ে আসতে বললেন। রসুল (সা.) নিলামের মাধ্যমে তা দু' দিরহামে বিক্রি করেন এবং এক দিরহাম দিয়ে তাকে খাবার কিনে দেন; অবশিষ্ট এক দিরহাম দিয়ে একটি কুঠার কিনে তাতে নিজ হাতে একটি বাট বা হাতল লাগিয়ে দেন। তিনি কুঠারটি হাতে তুলে দিয়ে বললেন, যাও, ঐ পাহাড়ে গিয়ে জ্বালানী কাঠ কেটে আনো এবং মদিনার বাজারে বিক্রি করো। এভাবে কাজ করে পনের দিন পরে আমার সাথে দেখা করো। সে ব্যক্তি ১৫ দিন পরে রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে জানাল যে, সে এতদিনে ১০ দিরহাম উপার্জন করেছে। ইতিহাস মতে, নবীর পরামর্শে ভিক্ষুক স্বাবলম্বী হয়ে গিয়েছিল; তাকে আর ভিক্ষা করতে হয়নি। ঐতিহাসিক ঘটনাটিতে আমাদের জন্য দারিদ্র্য বিমোচনের অনেকগুলো শিক্ষা রয়েছে যা নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

১. রাসূল (সা.) ভিক্ষাবৃত্তিকে উৎসাহিত করেননি। তাই বলে ভিক্ষুককে তাড়িয়েও দেননি। তার সাথে সুন্দর আচরণ করে জানতে চেয়েছেন যে, তার এমন কোনো প্রকার সম্পদ আছে কিনা যাকে পুনঃউপার্জনে কাজে লাগানো যেতে পারে এবং তা দিয়ে তাকে স্বাবলম্বী করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) একজন পরামর্শকের ভূমিকা পালন করেন।

২. লোকটি তার কম্বলখানা নিয়ে এলে রাসূল (সা.) সেটিকে পুনঃউপার্জনে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে বিক্রি করে কিছু নগদ অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগ নেন। তিনি দরকষাকষি করে কম্বলটি নিলামে উঠালেন। প্রথমে একজন এক দিরহাম এবং পরে দ্বিতীয়জন দুই দিরহাম বলেন। রাসূল (সা.) দুই দিরহামে অর্থাৎ সর্বোচ্চ দামেই সেটি বিক্রি করলেন। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্বচ্ছ পদ্ধতিতে নিলামে জিনিস বিক্রি বৈধ।

৩. কম্বলটি বিক্রির দুই দিরহাম হাতে পাওয়ার পর রাসূল (সা.) একটি বাজেট তথা ব্যবসা পরিকল্পনা তৈরি করেন।

৪. বাজেট তথা ব্যবসা পরিকল্পনা তৈরি করে রাসূল (সা.) প্রথমেই অগ্রাধিকার দেন ঐ ব্যক্তির মৌলিক চাহিদার প্রতি। তিনি তাকে

এক দিরহাম দিয়ে খাদ্য কিনে দেন। বাকি অর্ধেক দিয়ে টেকনোলজি তথা উৎপাদনের হাতিয়ার ক্রয় করেন।

৫. ক্রয়কৃত কুঠারটিকে লাগসই করার জন্য রাসূল (সা.) নিজ হাতে তাতে বাট বা হাতল লাগিয়ে দেন। লোকটি দেখল যে কীভাবে হাতল লাগাতে হয় এবং প্রযুক্তিকে উৎপাদনের উপযোগী করতে হয়। এতে তার প্রশিক্ষণ হয়ে গেলো।

৬. এরপর রাসূল (সা.) লোকটিকে ব্যবসার খাত তথা ট্রেড নির্বাচন করে দিয়ে বলেন যে, পাহাড় থেকে কাঠ কেটে জ্বালানি কাঠ হিসেবে ব্যবহারের উপযোগী তথা মূল্য সংযোজনের পরামর্শ দেন।

৭. লোকটির উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য বাজার দেখিয়ে দিয়ে রাসূল (সা.) তাকে মদিনার বাজারে যেতে বলেন। অর্থাৎ পণ্য বাজারজাতকরণের পরামর্শও মহানবী দিয়ে দিলেন।

৮. সব পরামর্শ দেয়ার পর রাসূল (সা.) লোকটিকে ১৫ দিন পরে তাঁর সাথে দেখা করতে বললেন। এর মানে রাসূল (সা.) মনিটরিং ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থাও করলেন।

৯. ১৫ দিন পরে লোকটি ফিরে এসে রাসূল (সা.)-কে জানাল যে, সে দশ দিরহাম উপার্জন করেছে। এর দ্বারা বুঝা গেলো যে, রাসূল (সা.) লোকটিকে ভিক্ষার পরিবর্তে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তা কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।

আলোচ্য ঘটনাবলি আধুনিক যুগের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হতে পারে। এর উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো :

১. ভিক্ষাবৃত্তি নয়; স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য কাজ করা;

২. ঋণ নয়, নিজের যে সম্পদ আছে তাকে অলস ফেলে রাখার পরিবর্তে আয়বৃদ্ধির কাজে লাগানো;

৩. সর্বোচ্চ মূল্য পাবার জন্য নিলাম করা;

৪. বাজেট বা ব্যবসা পরিকল্পনা তৈরি করা :

৫. বাজেটের অর্থ ব্যয়ে সর্বাগ্রে মৌলিক চাহিদা তথা খাদ্য চাহিদা পূরণ করা;

৬. প্রযুক্তিকে উৎপাদনের কাজে লাগানোর জন্য মূলধন যন্ত্রপাতি ক্রয়ে বিনিয়োগ করা;

৭. লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তর ও প্রশিক্ষণ প্রদান;

৮. ব্যবসার খাত তথা উপযুক্ত ট্রেড বাছাই করা;

৯. মূল্য সংযোজনের সুযোগ দেখিয়ে দেয়া;

১০. পণ্য বাজারজাতকরণের নির্দেশনা প্রদান;

১১. মনিটরিং, ফিডব্যাক ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা;

১২. স্বাবলম্বী হওয়ার কৌশল সফল প্রমানিত হওয়া।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এযুগে যারা দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল হিসেবে যারা বিভিন্ন টিপস দিয়ে থাকেন তার অধিকাংশই প্রায় দেড় হাজার বছর আগে নবী (সা.) বলে গেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়
বাংলাদেশে দারিদ্র্যবিমোচন প্রচেষ্টা

বাংলাদেশে দারিদ্র্য পরিস্থিতি

বিশ্বে বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল বা দরিদ্র দেশ হিসেবে পরিচিত। দীর্ঘদিন ধরে নানাবিধ কর্মকৌশল বাস্তবায়ন করা সত্ত্বেও এখনও দেশের বিরাট সংখ্যক জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করছে। সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও ধারনা করা হয় যে, দেশের কয়েক কোটি লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে জীবনযাপন করছে। সরকারি-বেসরকারি প্রচেষ্টায় গত দুই দশক ধরে প্রতি বছর গড়ে মাত্র ১% থেকে ১.৫% হারে দারিদ্র্য হ্রাস পাচ্ছে বলে মনে করা হয়।

আমাদের কাছে সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, এখনো দেশের কমপক্ষে এক-চতুর্থাংশ মানুষ দারিদ্র্য-সীমার নিচে বাস করে। এর মধ্যে হতদরিদ্রের সংখ্যাও ২৫% ভাগের মত। লক্ষ লক্ষ মানুষ পেটপুরে খেতে পায় না। অপুষ্টি ও অনাহারে অনেকের দিন কেটে যায়। রোদ-বৃষ্টি-শীতে তাদের বাসস্থান নেই। তাদের পরনে প্রয়োজনীয় কাপড় নেই। বিশুদ্ধ পানির অভাব। নেই স্যানিটেশন সুবিধা। অসুস্থ হলে চিকিৎসা নেই। শিশুরা অপুষ্টিতে জীর্ণশীর্ণ। অনেকে নদী ভাঙনে সর্বস্ব হারিয়ে বাস্তুহারা; তারা আশ্রয় নিয়েছে শহরের ঘিঞ্জি বস্তিতে। ভাগ্য বিড়ম্বিত এসব মানুষের জন্য সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কিন্তু ত্রাণ বিতরণ বা অপর্যাপ্ত কর্জ দিয়ে দারিদ্রের গহ্বর থেকে এদেরকে টেনে তোলা বেশ কঠিন।

বাংলাদেশে ২০০৫ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪০.৪ শতাংশ যা ২০১০ সালে হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ৩১.৫ শতাংশে। ২০১৩ সালের জুনে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের দারিদ্র্য নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, এমডিজিগুলোর আওতায় দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য দেশটি সঠিক পথে রয়েছে। বিশ্বব্যাংক পর্যবেক্ষণে বলেছিল যে, ২০১৩

সালে দারিদ্র্যের হার ২৬.৩১ থেকে ২৮.৪০ শতাংশের মধ্যে থাকবে যা বার্ষিক গড় হারে ১.৭৩৩ শতাংশ পয়েন্ট। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ২০০০ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্য এক বছরে ১.৭৮ শতাংশ পয়েন্ট হ্রাস পেয়েছে। পরের পাঁচ বছরে হ্রাসের হার গড়ে ১.৭ শতাংশ পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে যা জনসংখ্যার ৩১.৫ শতাংশে নেমে এসেছে।

তবে কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে দারিদ্র্য পরিস্থিতি আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। এ কারণে জুন, ২০২০ অবধি দেশের দারিদ্র্য বেড়েছে ২৯.৫%। বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের সাবেক সদস্য ড. শামসুল আলমের মতে, মার্চ-জুন ২০২০ সময়কালে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক খাতে বিপুল সংখ্যক লোক চাকরি হারিয়েছে। সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) মতে, বিভিন্ন শহর ও শহরের আশেপাশে কমপক্ষে ২.৯ মিলিয়ন মানুষ নতুন করে দরিদ্র হয়ে পড়েছে যারা কোভিড-১৯ লকডাউনের আগে দরিদ্র ছিল না। এ সব পরিবারগুলো ২০ টি শহরে স্বল্প-আয়ের জনবসতিগুলোতে নতুন দরিদ্র শ্রেণি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এর ফলে বেকার পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে।

দারিদ্র্য বিমোচনের প্রচলিত কৌশলসমূহ

বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশক থেকে বাংলাদেশ দৃশ্যত ঃ পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের একটি পরীক্ষাগারে পরিনত হয়েছে। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান নানাবিধ তত্ত্ব (থিউরি), কৌশল বা মডেল নিয়ে হাজির হয়েছে এবং এদেশে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এখনও তা চলছে। অবশ্য বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার তত্ত্ব ও ধারণার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কৌশল নির্ভর করে সে সংস্থার নিজস্ব নীতি ও মূল্যবোধের উপর। যেমন- সংস্থাটি ঋণদানকারী হলে মুনাফা ও আদায় কৌশল তার কাছে মুখ্য হয়। আবার একটি খ্রিষ্টান চ্যারিটি সংস্থা হলে তার কার্যক্রম এক রকম হয়। সেটি ইসলামী সংস্থা হলে তার বৈশিষ্ট্য আরেক রকম হয়। অবশ্য বাংলাদেশে যারা কাজ করে তাদের সবার কাছে একটি বিষয় অভিন্ন এবং পরীক্ষামূলক মুখ্য কর্মসূচি রয়েছে; আর তা হলো দারিদ্র্য দূরীকরণ। পরীক্ষামূলক বলা হচ্ছে এজন্য যে, তাদের

কোন মডেলই চূড়ান্তভাবে টেকসই বলে গণ্য হয়নি। এলক্ষ্যে সরকার দাতা সংস্থার পরামর্শে একটি দারিদ্র্যবিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) তৈরি করে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা চালায় এবং পরবর্তীতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এখন সরকার জাতিসংঘের ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) বাস্তবায়নের কার্যক্রম চালাচ্ছে। পাশাপাশি বহু বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। লক্ষ্যনীয় বিষয় হচ্ছে যে, সরকারি-বেসরকারি প্রায় সব সংস্থাই ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিকে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রধান কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছে। এমনকি গ্রামীন ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি এবং ড. মুহাম্মদ ইউনূস শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। অবশ্য এখন অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন যে, ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য যথেষ্ট বা কতটা কার্যকর। কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ বলেছেন যে, দারিদ্র্য দূর করতে হলে সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে হবে এবং দরিদ্রদের কাছে সম্পদ হস্তান্তর করে তাদেরকে সম্পদের মালিক বানিয়ে দিতে হবে।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে সরকার দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশলগুলো পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনারভিত্তিতে এবং তাদের বিস্তৃত কাঠামোর মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তিতে সামষ্টিক পর্যায়ে তৈরি করা হয়েছিল। বিগত পাঁচ দশকে সরকারি সংস্থাগুলোর পাশাপাশি এনজিওগুলোও দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যাপকভাবে কাজ করেছে।

বিশ্বব্যাংকের অভিমত হচ্ছে, দারিদ্র্যের সংকট কাটিয়ে ওঠা এবং আগামী দশক নাগাদ মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশকে জিডিপি পবৃদ্ধি ৭.৫% থেকে ৮% পর্যন্ত উন্নীত করতে হবে এবং রেমিট্যান্স বৃদ্ধি ৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি করতে হবে (হোসেন এম এবং সেন বি, ১৯৯২)। সমাজে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিশেষজ্ঞরা মতামত দিয়েছেন যে, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য হ্রাসের হার উল্লেখযোগ্য হলেও শহরাঞ্চলে এটি ধীরগতিতে হয়েছে। এখন স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, দারিদ্র্য হ্রাস এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সুষমভাবে হয়নি; কারণ যেখানে চারজনের মধ্যে একজন এখনও দারিদ্র্যে বাস করছেন এবং সমস্ত নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ তৈরি করার জন্য অনেক কিছু করা দরকার (বিশ্বব্যাংক,

২০১২)। বিশ্ব খাদ্য সংস্থা কৃষি ও অকৃষি খাত উন্নয়ন, জীবিকা নির্বাহের জন্য দরিদ্রদের কাছে সম্পদ স্থানান্তর, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারী শ্রমশক্তি বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, মানব উন্নয়নের জন্য শিক্ষা সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়ে বেশকিছু পদক্ষেপের পরামর্শ দিয়েছে। সামাজিক সুরক্ষাজাল, আরও ভালো ডাটাবেজ ইত্যাদি। দাতারা এনজিওগুলোকে বাংলাদেশের দারিদ্র্যবিমোচন কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশীদার হিসেবে রাখার পরামর্শ দিয়েছিল। এমনকি সরকারের 'এক্সক্লুসিভ ডোমেন' এর অধীনে পরিচালিত খাতেও কাজ করার সুযোগ দিতে বলেছিল (রেহমান এস এবং ভট্টাচার্য ডি, ১৯৯০)। উন্মুক্ত বাজার নীতি দ্বারা পরিচালিত সরকারি পরিকল্পনায় ধরে নেয়া হয়েছিল যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সব গোষ্ঠীর কাছেই ট্রিকল-ডাউন হবে। তবে তারা বুঝতে পারেনি যে, দারিদ্র্য বিমোচনের কর্মসূচিগুলো থেকে সব শ্রেণি দরিদ্র সমানভাবে উপকৃত হতে পারে না (আমিনুজ্জামান এস, ১৯৯৩)।

বেশিরভাগ এনজিও মনে করে যে, ক্ষুদ্রঋণ (মাইক্রোক্রেডিট) কর্মসূচি দারিদ্র্য হ্রাস করার একটি কার্যকর কৌশল। তাদের যুক্তি ছিল যে, ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি অন্যান্য দারিদ্র্যবিমোচন কর্মসূচির চেয়ে বেশি সাশ্রয়ী। ১৯৮০-এর দশকে, 'মাইক্রোক্রেডিট' শব্দটি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা এবং আরও অনেকের কাছে একটি জনপ্রিয় (অতিরঞ্জিত) পরিভাষায় পরিণত হয়েছিল। বিশ্বব্যাপী অনেক ব্যক্তি ক্ষুদ্রঋণ প্রচারের পক্ষে ছিলেন। 'ক্ষুদ্রঋণ এমন একটি ধারণা যার সময় এসেছে' মন্তব্য করেছিলেন জাতিসংঘের প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল কফি আনান। ক্ষুদ্রঋণের জনক প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন যার ফলে তিনি বৈশ্বিক অঙ্গনে আইকন ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন। ড. ইউনূস 'গরিবদের জন্য ব্যাংক' তৈরির নিজস্ব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সম্প্রদায়ের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য তহবিল আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন; যার ফলশ্রুতিতে তার পরিকল্পনাটি গ্রামীণ ব্যাংকে রূপান্তরিত হয়েছিল। অধ্যাপক ইউনূস প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, মাইক্রোক্রেডিট সর্বত্র দরিদ্রদেরকে তাদের দারিদ্র্য ও বঞ্চনা থেকে খুব দ্রুত মুক্তি পেতে সহায়তা করবে। তাঁর বিখ্যাত উক্তি 'দারিদ্র্য একটি প্রজন্মের মধ্যে মুছে ফেলা হবে' এবং আমাদের সন্তানদের অতীতের সমস্ত উদ্বেগ কী ছিল তা দেখার জন্য 'দারিদ্র্য

জাদুঘর' -এ যেতে হবে (ব্যাটম্যান এম। ২০১৪)। এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে, জাতিসংঘ ২০০৫ সালকে মাইক্রোক্রেডিট-এর আন্তর্জাতিক বর্ষ ঘোষণা করে।

তবে বিভিন্ন সমীক্ষায় বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষের জীবনে ক্ষুদ্রঋণের অর্থের ইতিবাচক প্রভাব দেখা যায়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের নিম্নলিখিত ইতিবাচক প্রভাব চিহ্নিত করেছে : (ক) বাংলাদেশ খানাপ্রতি আয় এবং ব্যয় সমীক্ষা, ২০১০ থেকে জানা গেছে যে, দরিদ্রদের ঋণ সংগ্রহের একমাত্র উৎস হচ্ছে গ্রামীণ ব্যাংকসহ ক্ষুদ্র আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো। এটি ইঙ্গিত করে যে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি দরিদ্রদের বর্ধিত সম্পদ আহরণের কার্যকর কৌশল হতে পারে। (খ) ক্ষুদ্রঋণ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো (এমএফআই) প্রমাণ করেছে যে ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতাদের ঋণ পরিশোধের হার ৯০ শতাংশেরও বেশি। (গ) বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ক্ষুদ্রঋণ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অবদান রাখে যা দারিদ্র্য হ্রাসে অবদান হিসেবে গণ্য হয়েছে। (ঘ) বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্তদের ৯০% মহিলা যারা উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে তাদের সক্ষমতা বাড়াতে পেরেছে। এর অর্থ মাইক্রোক্রেডিট দরিদ্র মহিলাদের ক্ষমতায়নের সুবিধার্থে একটি কার্যকর পদ্ধতি (সর্দার এম আর নবী জি, ২০১০)।

বিকল্প মডেলের সন্ধানে

২০০৬-২০০৭ সাল থেকে মাইক্রোক্রেডিট মডেল বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে শুরু করে। মডেলটির দীর্ঘকালীন সমর্থকরা স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, 'মাইক্রো-ক্রেডিট মডেল দারিদ্র্যের উপর কোনও ইতিবাচক প্রভাব ফেলেনি'। নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্ত দেখে এক সময়ের মাইক্রোক্রেডিটের কঠোর সমর্থকরাও স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, ক্ষুদ্রঋণ আসলে দারিদ্র্যবিমোচনে বিশেষ কোনো অবদান রাখতে পারেনি। পরবর্তীকালে, মাইক্রোক্রেডিট মডেলটির জনপ্রিয়তা বেশ নাটকীয়ভাবে হ্রাস পায় (ব্যাটম্যান এম ২০১৪)।

২০১০ সালের পরে বহু গবেষণাপত্র প্রকাশিত হতে শুরু করে যা এ সত্যকে নির্দেশ করে যে, ক্ষুদ্র ঋণ দরিদ্রদের উপর চূড়ান্তভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এ নেতিবাচক পর্যবেক্ষণগুলো তখন মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রে একটি গবেষণার ফলাফল দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল যাতে দেখা গিয়েছিল যে, মাইক্রোক্রেডিট থেকে ইতিবাচক প্রভাবের সমস্ত প্রমাণই ছিল 'পক্ষপাতদুষ্ট, ত্রুটিযুক্ত বা অবিশ্বাসযোগ্য'। বাটম্যানের মতে, 'আজ মাইক্রোক্রেডিট মডেল অস্তিত্বের হুমকির সম্মুখীন' (ব্যাটম্যান এম ২০১৪)। অন্যান্য অনেক গবেষণায় মাইক্রোক্রেডিট মডেলের ব্যর্থতার একই সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

মাইক্রোক্রেডিট প্রোগ্রাম বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের বিষয়ে বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলো প্রকাশিত হয়েছিল : (ক) দারিদ্র্যের প্রচলিত সংজ্ঞা কেবল বস্তুগত চাহিদাপূরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করে এবং আধ্যাত্মিকতা উপেক্ষা করে; (খ) মাইক্রোক্রেডিট মডেল সমাজের চরম দরিদ্রদের আর্থিক পরিষেবা সরবরাহ করে না; (গ) ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির প্রতি উচ্চমাত্রার যে আগ্রহ রয়েছে তা লোভ এবং ব্যবসায়িকতা নির্দেশ করে; (ঘ) মাইক্রোক্রেডিট মডেল এবং সম্পদ হস্তান্তর কর্মসূচি কোনটিই সমন্বিত নয়; কারণ এতে সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন মানবিক চাহিদাপূরনের ব্যবস্থা নেই; (ঙ) ঋণ কর্মসূচি দাতাদের ইচ্ছানুসারে ডিজাইন করা হয়; যেমন এটি অংশগ্রহণমূলক নয়, বরং আরোপিত; (চ) পরিষেবা প্রদান ও তার ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াগুলোতে স্বচ্ছতা এবং বিধিবিধান অনুসৃতির অভাব রয়েছে; (ছ) দরিদ্র পরিবারের ঋণের দায়বদ্ধতার চেয়ে ইক্যুইটি মূলধন সহায়তা বেশি প্রয়োজন; (জ) মাইক্রোক্রেডিট কর্মসূচি পরিবারকে ফোকাস না করে কেবল মহিলাদেরই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে; (ঝ) বেশিরভাগ মাইক্রোক্রেডিট এবং সম্পদ স্থানান্তর কর্মসূচি বিদেশি সহায়তার উপর নির্ভরশীল যা টেকসই নয়; (ঞ) মাইক্রোক্রেডিট মডেল এবং সম্পদ স্থানান্তর কর্মসূচিতে মেয়াদ পূর্তির পর কোনো টেকসই ব্যবস্থা নেই; এবং (ট) সুদভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণ মডেল মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক। উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা এখন দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে, দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আরও ইতিবাচক এবং টেকসই পদ্ধতি উদ্ভাবন করা দরকার।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সিজেডএম-এর দারিদ্র্যবিমোচন কৌশল ও কর্মসূচি

বাংলাদেশে মুক্তবাজার অর্থনৈতিক অবকাঠামোর আওতায় দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কয়েক দশকেরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন ধরণের মডেল এবং পদ্ধতির পরীক্ষা করা হয়েছে। তবে বাস্তবে দেখা যায় যে, এ সব মডেল দারিদ্র্য বিমোচনে খুব বেশি কার্যকর হয়নি। বিশেষত, কিছু সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, মাইক্রো ফিনান্স প্রতিষ্ঠানগুলো হতদরিদ্রদের কাছে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছে। কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, কিছু ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণ মহাজনদের কাছ থেকে নতুন ঋণ নিয়ে ঋণের কিস্তিগুলো পরিশোধের জন্য ঋণচক্র তৈরি হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে আরও ব্যাপক। সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম) যাকাতভিত্তিক দারিদ্র্য বিমোচনের কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রচলিত পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে 'জীবিকা' নামে একটি সমন্বিত আয়বর্ধন ও জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যায় যে, জীবিকা প্রকল্পগুলো ইক্যুইটি ক্যাপিটাল হস্তান্তর, দক্ষতা বিকাশ প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা সহায়তা ও স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবার অভিগম্যতা তৈরি, নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ, স্যানিটেশন এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের উজ্জীবনের মাধ্যমে দরিদ্রদের স্বাবলম্বী করা এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় সফল হয়েছে।

দারিদ্র্যবিমোচন কৌশল

ক. মুস্তাহিক (যাকাতের হকদার) চিহ্নিতকরণ :

সিজেডএম জনবলের মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে সমাজের আনাচে-কানাচে অসহায় দরিদ্র যারা যাকাত পাওয়ার অধিকার রাখে তাদেরকে খুঁজে বের করা, তাদের সংগঠিত করা, তাদের কাছে যাকাত তহবিল এবং সেবা পৌঁছে দেয়া, তাদেরকে

অভিভাবকের মত সাহায্য করা, তাদের তহবিলের সংরক্ষণ ও হিসাব রাখা, বিনিয়োগে উপযুক্ত পরামর্শ দেয়া।

আল কুরআনের আলোকে যাকাতের হকদার সঠিকভাবে চিহ্নিত করার জন্য জরিপ পরিচালনা করে তাদের যাকাত প্রাপ্তির গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই 'ফুকারা' ও 'মাসাকীন' তথা হতদরিদ্র পরিবারগুলো প্রাধান্য পায়। 'ফুকারা' শ্রেণির লোকজন হচ্ছেন তারা যাদের তেমন কোনো সম্পদ নেই বা উপার্জন করারও সামর্থ্য নেই যা তাদের মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে পারে। বেঁচে থাকার জন্য তাদেরকে অন্যের কাছে হাত পাততে হয়। তারা মূলত ঃ 'অনুৎপাদনশীল' জনগোষ্ঠী যেমন শারীরিক প্রতিবন্ধী, অসহায় এতিম শিশু, বয়োবৃদ্ধ, দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত ইত্যাদি। এরূপ জনগোষ্ঠীর বেঁচে থাকার জন্য মৌলিক চাহিদা পূরণের কর্মসূচি নেয়া হয় যেমন, তাদেরকে খাদ্য, পরিধেয় বস্ত্র, আবাসন ও চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হয়।

অপরদিকে, 'মাসাকীন' হচ্ছে উপার্জন-সক্ষম (উৎপাদনশীল) দরিদ্র পরিবার যাদের উপার্জন এত কম যে তা দিয়ে তাদের প্রয়োজন পূরণ হয় না। এরূপ উৎপাদনশীল পরিবারগুলোকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে তাদের সক্ষমতা ও চাহিদা নিরূপণ করে তাদেরকে আয়-বর্ধক কাজে নিয়োজিত করার জন্য সহায়তা প্রদান করা হয়। যেমন, তাদেরকে মূলধন ও দক্ষতা বৃদ্ধিও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

খ. জাতীয় নীতি ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা :

বাংলাদেশের দারিদ্র্যবিমোচন ও উন্নয়ন নীতিমালা এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (SDG) সাথে সামঞ্জস্য রেখে সিজেডএম জীবিকা কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে। এসডিজি-র বেশ কয়েকটি লক্ষ্যমাত্রা জীবিকা কর্মসূচির মাধ্যমে অর্জন করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

গ. সমন্বিত বহুমুখী কর্মসূচি :

সিজেডএম বিশ্বাস করে যে, একটি পরিবারে দারিদ্র্য পরিস্থিতি কোনো একক কারণে সৃষ্টি হয় না। এর নানা কারণ থাকতে পারে। আর সেজন্য দারিদ্র্য দূরীকরণের কর্মসূচিও হতে হবে বহুমুখী ও সমন্বিত। সিজেডএম-এর জীবিকা উন্নয়ন কর্মসূচি একটি সমন্বিত কর্মসূচি যার আওতায় মূলধন সরবরাহ, নিয়মিত সঞ্চয়, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন, শিশু শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ উজ্জীবন, তৃণমূল দল প্রতিষ্ঠা, আয়বর্ধনমূলক কাজে সম্পৃক্ত করা ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকতে হবে। এসব কিছুই দারিদ্র্যবিমোচন ও টেকসই উন্নয়নের উপাদান হিসেবে কাজ করবে।

ঘ. দলগত উদ্যোগ :

সিজেডএম-এর জীবিকা কর্মসূচি মূলত ঃ একটি দলগত বা ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ। পাড়া-প্রতিবেশী ও একই এলাকার ২৫-৩০ টি পরিবার নিয়ে একটি তৃণমূল সংগঠন (Grass Roots Organization-GRO) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ সংগঠনে নির্বাচিত সভাপতি, সেক্রেটারি ও কোষাধ্যক্ষ থাকে। তারা প্রতি সপ্তাহে সভায় মিলিত হয়ে নিজেদের আয়-উপার্জনের কৌশল ও পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করে এবং সম্মিলিত পরামর্শ ও প্রচেষ্টায় তাদের জীবনমান উন্নয়নের চেষ্টা চালায়। শান্তিতে বসবাসের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক ও সৌহার্দ্য বজায় থাকা অপরিহার্য। সিজেডএম-এর প্রতিটি কর্মসূচি সদস্যদের আন্তঃসম্পর্ক বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

ঙ. সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তহবিল :

লক্ষ্য করা গেছে যে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর যে অংশটি উৎপাদনশীল কাজ করতে সক্ষম তাদের প্রধান সংকট হচ্ছে পুঁজির অভাব। ঋণ গ্রহণ করে পুঁজি গঠন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও তা টেকসই হয় না। যাকাত যেহেতু দরিদ্রের অধিকার এবং তা কোনো করুণা নয়,

সেহেতু যাকাত প্রাপককে মালিকানাসহ তহবিল হস্তান্তর করা হয়। সিজেডএম এ ক্ষেত্রে নগদ অর্থ হাতে দেয়ার পরিবর্তে বিনিয়োগের সুবিধার্থে দলগত যৌথ ব্যাংক হিসাবে সদস্যদের সম্মতিতে তহবিল হস্তান্তর করে। যাকাত থেকে প্রাপ্ত তহবিল ও ব্যক্তিগত সঞ্চয় নিয়ে তাদের জন্য একটি 'সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তহবিল' গঠন করা হয় এবং তারা সম্মিলিত পরামর্শের ভিত্তিতে নিজ নিজ বিনিয়োগ পরিকল্পনা তৈরি করে। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তহবিল পরিচালনার জন্য একটি নীতিমালা রয়েছে।

চ. ব্যবস্থাপনা সেবা :

তৃণমূল সংগঠনের সদস্যরা সক্ষমতার অভাবে স্বল্প পুঁজি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পেরে আবার যাতে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে নিপতিত না হয় সে কৌশল গ্রহণ করতে হবে। এ জন্য সিজেডএম হতদরিদ্র পরিবারগুলোর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, পণ্য ক্রয় ও বাজারজাতকরণ, ব্যাংকিং সুবিধা সহজীকরণ, হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাদের সার্বিক কর্মকাণ্ড মনিটরিং ও তত্ত্বাবধান করা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করে। এজন্য জিআরও সদস্যদের সম্মতি নিয়ে সিজেডএম-এর প্রশিক্ষিত জনবলকে তাদের সেবায় নিয়োজিত করা হয়। যাকাত কর্মীরা ব্যবসা পরিকল্পনা থেকে শুরু করে হিসাব রাখা পর্যন্ত নানাবিধ বিষয়ে তাদেরকে সহযোগিতা প্রদান করে।

ছ. সরকারী পরিষেবা প্রাপ্তির অভিগম্যতা :

জনগণের কল্যাণে নানাবিধ পরিষেবা প্রদানের জন্য রয়েছে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ও দফতর। কিন্তু দরিদ্র জনগোষ্ঠী ঐসব সংস্থা থেকে সহজে প্রয়োজনীয় পরিষেবা নিতে সক্ষম হয় না। যাকাত কর্মচারীরা প্রকল্পের হতদরিদ্র পরিবারগুলোকে সরকারি পরিষেবা পেতে সাহায্য করে। অপরদিকে, যাকাত প্রাপকদের কাছে তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধির জন্য মোবাইল ও কম্পিউটার প্রযুক্তির লভ্যতা সহজ করার চেষ্টা চালাতে হবে। সরকারি সুবিধা পাওয়া ও নিজস্ব

পণ্য উৎপাদন প্রযুক্তির ব্যবহার ও বাজারজাতকরণে তথ্য প্রাপ্তি বিরাট অবদান রাখতে পারবে।

জ. নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের উজ্জীবন :

সিজেডএম উন্নয়নের দর্শন হিসেবে 'মাকাসিদ আল শরীয়াহ'-কে দিক-নির্দেশক মনে করে। এর অর্থ হচ্ছে মানব জীবনের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনের কল্যাণ সাধন করাই হচ্ছে উন্নয়নের সূত্র। ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ সুনাগরিক তৈরিতেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সিজেডএম তার সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি ব্যক্তি ও পরিবারকে ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করার চেষ্টা চালায়। জীবিকা প্রকল্পের পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বাস্তবায়ন পুরাপুরি শরীয়ার নির্দেশনার আলোকে হয়ে থাকে। এ বিষয়ে যোগ্য আলেম ও পণ্ডিতদের নিয়ে গঠিত সিজেডএম শরীয়াহ সুপারভাইজরি বোর্ড প্রয়োজনীয় নীতিমালা, নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে।

ঝ. অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা :

সিজেডএম মনে করে যে, দারিদ্র্যবিমোচন ও উন্নয়ন পরিকল্পনা উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া (Top to bottom) বাস্তবসম্মত নয়। বরং যে কোনো কর্মসূচির তৃণমূল পর্যায়ের সুবিধাভোগীদের সম্পৃক্ত করে (Bottom up approach) তাদের চাহিদা ও পরামর্শের আলোকে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে দরিদ্র পরিবারের মহিলাদেরকে তাদের জীবনমান উন্নয়ন পরিকল্পনায় সংযুক্ত করা হয়। পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য আল কুরআনে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যা আধুনিক কালের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। সিজেডএম পরিচালিত জীবিকা উন্নয়ন প্রকল্পের দলীয় সদস্যদের সাথে পারস্পরিক পরামর্শ এবং তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসা পরিকল্পনা থেকে শুরু করে সব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। জীবিকা উন্নয়ন কেন্দ্রও গঠিত হয় সব তৃণমূল সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণের ভিত্তিতে। আবার সিজেডএম এর

কেন্দ্রীয় পরিচালন ব্যবস্থায় একক কোন নেতৃত্বের প্রাধান্য নেই। সব পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব ও ভারসাম্য বজায় রাখার নীতি অনুসরণ করা হয়।

ঞ. নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা :

জীবিকা উন্নয়ন কেন্দ্র ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচিতে সুবিধাভোগী পরিবারগুলোর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই নারী ও শিশু। পরিবারের পুরুষ সদস্যরা যেহেতু অধিকাংশই ঘরের বাইরে কাজে ব্যস্ত থাকে, তাই জিআরওতে প্রতিনিধি হিসেবে নারীদের মনোনীত করে থাকে। সিজেডএম কর্মীরা জিআরও সদস্যদের নারীর সঠিক মর্যাদা ও তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে। অপরদিকে, নারীর কর্মক্ষমতাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পরামর্শ দেয়া হয়। ফলে জীবিকা উন্নয়ন কেন্দ্র ও জিআরও নারী বান্ধব প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে।

ট. অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থা :

বাংলাদেশের সমাজে ৯০% ভাগ মুসলিম জনগোষ্ঠী বসবাস করলেও বিভিন্ন ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও নৃতাত্ত্বিক উপ-জাতিও বাস করে। তাদের মধ্যেও রয়েছে দরিদ্র জনগোষ্ঠী। দারিদ্র্যবিমোচন ও মানব উন্নয়ন কর্মসূচিতে কোনোভাবেই তাদেরকে বাদ দেয়া হয় না। ইসলামের যাকাত ছাড়াও রয়েছে সাদাকা, ওয়াকফ ইত্যাদি ব্যবস্থা রয়েছে যার আওতায় ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবকে সিজেডএম কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সিজেডএম মাতৃগর্ভের শিশুর যত্ন নেয়া থেকে শুরু করে মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সেবা পর্যন্ত নানাবিধ কাজ করে থাকে। এছাড়া ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

ঠ. সচেতনা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণঃ

তৃণমূল সংগঠনের সদস্যদের নেতৃত্ব বিকাশের জন্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ ক্ষেত্রে তৃণমূল সংগঠনের ব্যবস্থাপনা, আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা, আয়বৃদ্ধিমূলক

কার্যক্রমের বৈচিত্র্য ও উন্নয়নমূলক বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হয়। ব্যবসায় অগ্রসর সদস্যদের উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিভিন্ন ব্যবসার ধরণ অনুযায়ী দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য প্রশিক্ষক হিসেবে উপজেলার সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের আমন্ত্রন জানানো হয়।

দারিদ্র্যবিমোচন কার্যক্রম

এক. মানবিক সহায়তা কার্যক্রম

ক. ***বিশেষ দল গঠন*** : যাকাত কর্মচারীরা জীবিকা কার্যক্রমের শুরুতেই মুস্তাহিক বাছাইয়ের সময় কাজে অক্ষম, প্রতিবন্ধী, অতিবৃদ্ধ/বৃদ্ধা, মানসিক প্রতিবন্ধী, এতিম শিশুসহ বিধবা মাতা— এরূপ যে সব পরিবারের খাবারের সংস্থান নেই, চিকিৎসা পায় না, প্রয়োজনীয় পরিধেয় বস্ত্র নেই এবং গৃহহীন তাদের নিয়ে আলাদা তালিকা তৈরি করা হয়। এ তালিকাভুক্ত সদস্যরা একটি 'বিশেষ দল' হিসেবে গণ্য হয়।

খ. ***খাদ্য সহায়তা :*** বিশেষ দলের সদস্যদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রতি মাসে প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্যপণ্য (চাল, ডাল, আলু, তেল ইত্যাদি) তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেয়া হয়।

গ. ***চিকিৎসা সেবা :*** জিআরও পরিবারের সব সদস্যকে ফেরদৌসি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান করা হয়। তাদেরকে উচ্চতর হাসপাতালে রেফারেল চিকি সেবাও দেয়া হয়।

ঘ. ***নিয়মিত ওষুধের ব্যবস্থা :*** যে সব পরিবারের সদস্যরা দুরারোগ্য জটিল রোগে ভুগছেন এবং দীর্ঘ দিন ওষুধ গ্রহণ করতে হবে, তাঁদের যদি ওষুধ ক্রয়ের সামর্থ্য না থাকে, তাহলে তাঁদেরকে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে নিয়মিত ওষুধের ব্যবস্থা করা হয়।

ঙ. ***প্রতিবন্ধীদের সহায়তা :*** যে সব প্রতিবন্ধীকে চলাচলের সুবিধার্থে বিশেষ ডিভাইস (হুইল চেয়ার ইত্যাদি) দেয়া প্রয়োজন তাদেরকে সেবা দিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়।

চ. ***পরিধেয় বস্ত্র ও শীতবস্ত্র প্রদান :*** খাদ্য সহায়তাপ্রাপ্ত পরিবারের সদস্যদের বছরে অন্তত ঃ দু'সেট পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রয়োজন মাফিক শীতের মওসুমে শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়।

ছ. ***বসবাসের উপযোগী ঘর নির্মাণ :*** যে সব পরিবারের বসবাসের উপযোগী ঘর নেই, তাদেরকে ঘর তৈরি করে দেয়া হয়।

জ. ***চোখের ছানিপড়া রোগী বা শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা :*** যে সব পরিবারে চোখের ছানিপড়া রোগী বা শ্রবণ প্রতিবন্ধী সদস্য রয়েছে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

দুই : আয়-বর্ধক কার্যক্রম

ক. ***বিনিয়োগ প্রদান ও ফেরত গ্রহণ :*** জিআরও সদস্যরা সম্মিলিত পরামর্শের ভিত্তিতে আয়-বর্ধক কাজে বিনিয়োগের পরিকল্পনা তৈরি করে এবং বিনিয়োগ গ্রহণ করে। প্রকল্প ব্যবস্থাপক ও মাঠ কর্মকর্তারা সদস্যদের ব্যবসা পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করেন। বিনিয়োগ প্রদানের পূর্বে বিনিয়োগ গ্রহণকারীর সঠিক আয়-বৃদ্ধিমূলক কাজ নির্বাচন করতে হয়। এজন্য জিআরও-এর পরিচালনা কমিটি আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে বিনিয়োগ প্রস্তাব যাচাই, বিনিয়োগ পদ্ধতি নির্ধারণ, অনুমোদন ও বরাদ্দ প্রদান করে।

খ. ***ব্যবসার পণ্য ক্রয় :*** জিআরও-এর একটি ক্রয় কমিটি থাকে। এর তত্ত্বাবধানে বিনিয়োগের পণ্য ক্রয় করে দেয়া হয়। বিনিয়োগের অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা এবং আইজিএ বাস্তবায়ন হয়েছে কিনা তা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্মকর্তারা এবং ক্রয় কমিটি নিশ্চিত করেন।

গ. ***যৌথ ব্যবসা :*** জিআরও সদস্যরা সমবায়ভিত্তিতে দল গঠন করে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। তারা দলে থাকলেও তাদের যেমন ব্যক্তিগত বিনিয়োগ থাকে, তেমনি তারা সমবায়ভিত্তিক দলগত বিনিয়োগও করতে পারে। তা ছাড়া ২-৩ হাজার সদস্য সমন্বয়ে একটি জীবিকা উন্নয়ন কেন্দ্র নিজেই একটি সংরক্ষিত বাজার। GRO

Business Circle গঠন এবং সমবায়ভিত্তিক খামার স্থাপন করে জীবিকা সদস্যরা আয়বর্ধনমূলক কাজটি ত্বরান্বিত করে থাকে।

ঘ. ***উদ্যোক্তা উন্নয়ন :*** সিজেডএম মনে করে, গরিব জনগোষ্ঠীর অনেকের মধ্যে সৃজনশীলতা রয়েছে যার বিকাশ ঘটানো সম্ভব হলে তাদের জীবনমান দ্রুত উন্নত হবে এবং উৎপাদনশীল জনশক্তিকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা যাবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সিজেডএম কর্মীরা সফল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালায়। বিশেষ করে জিআরও সদস্যদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত বেশি সফলতা দেখাতে পারে এবং বুদ্ধি-বিবেচনা অপেক্ষাকৃত ভালো তাদেরকে টার্গেট করে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

ঙ. ***কর্জে হাসানা তহবিল :*** জিআরও সদস্যরা বিভিন্ন আয়বর্ধক কাজ করে যে মুনাফা করবে তা দিয়ে যাতে অগ্রাধিকারভিত্তিতে তাদের ঋণ পরিশোধ করে সেজন্য তাদেরকে পরামর্শ দেয়া হয়। তবে ঋণ পরিশোধের জন্য বিশেষ বিবেচনায় 'কর্জে হাসানা তহবিল' থেকেও সহায়তা করা হয়। প্রকল্পের মেয়াদ শেষে যাতে কেউ ঋণগ্রস্ত না থাকে সে লক্ষ্য অর্জন করার চেষ্টা চালানো হয়।

চ. ***প্রকল্পের মেয়াদ শেষে তহবিল হস্তান্তর:*** প্রকল্প মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তৃণমূল দলের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তহবিলের হিসাব সদস্যদের বুঝিয়ে দেয়া হয় এবং প্রত্যেকের জন্য ব্যাংক হিসাব খুলে তাতে তাদের পাওনা স্থানান্তর করা হয়।

ছ. ***পণ্য বাজারজাতকরণ :*** তৃণমূল সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য সঠিকভাবে বাজারজাতকরণের উপর তাদের আয় বৃদ্ধির বিষয়টি অনেকটা নির্ভরশীল। সিজেডএম-এর প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা, প্রকল্প ব্যবস্থাপক ও অন্যান্য জনবল এ ক্ষেত্রে সহায়কের ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন এলাকার জীবিকা উন্নয়ন কেন্দ্রের সাথে সংযোগ স্থাপন করে পণ্য বাজারজাতকরণের কাজটি করা হয়। পাশাপাশি পণ্যের বহুমুখীকরণ, নতুন ডিজাইন ও গুণগতমান বজায়

রাখার জন্য সদস্যদের উদ্বুদ্ধ ও সহযোগিতা করা হয়। এ তিনটি বিষয়কে সামনে রেখে বাজারজাতকরণ কৌশল গ্রহণ করার ফলে সাফল্যের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

জ. ***কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ :*** জিআরও সদস্যদের বিনিয়োগ গ্রহণের সাথে সাথে তাদেরকে উৎপাদন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এজন্য সরকারি অফিসারদের সহায়তা নেয়া হয়। এ ছাড়া জিআরও পরিবারগুলোর স্বল্প শিক্ষিত বেকারদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষায় উজ্জীবিত করে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা চালানো হয়।

ঝ. ***প্রযুক্তি হস্তান্তর :*** বর্তমান প্রযুক্তির যুগে দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে কর্মসংস্থান ও উৎপাদনশীল কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করতে হলে আধুনিক ও ক্ষেত্র বিশেষে লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তর করতে হবে। সিজেডএম প্রশিক্ষণ ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তর করার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে পাশাপাশি ডিজাইন ও উদ্ভাবনের উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়।

ঞ. ***ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা :*** দরিদ্র পরিবারগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, বার্ধক্য ইত্যাদি কারনে ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। অপরদিকে, বিনিয়োগও অনেক সময় ঝুঁকির মুখে পড়ে, যেমন গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি মহামারিতে মারা যেতে পারে। তাছাড়া নদী-ভাঙন ও ঘূর্নিঝড়ে বসতবাড়ি ধ্বংস হতে পারে। এ ক্ষেত্রে সিজেডএম-এর 'ইনসানিয়াত' কর্মসূচি একটি কার্যকর ব্যবস্থা। এ ছাড়া দলীয় সৌহার্দ্যবোধের কারণে অন্য সদস্যরা তাদের বিপদে এগিয়ে আসবেন বলে আশা করা যায়। সর্বোপরি, বড় ধরনের ঝুঁকি মোকাবেলায় যাকাতদাতারা সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন।

ট. ***ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করা :*** তৃণমূল সংগঠন (জিআরও)-এর কোনো সদস্য ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত থাকলে তাকে দ্রুততার সাথে তা পরিত্যাগে উদ্বুদ্ধ করা হয় এবং তাকে বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করে

দেয়া হয়। তিনি সত্যিকার অর্থে কাজ করতে সক্ষম না হলে তাকে 'বিশেষ দলভুক্ত' করে খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়।

তিন : স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম :

ক. ***ফেরদৌসি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র :*** স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি মানব জীবনের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সিজেডএম-এর ফেরদৌসি নারী ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে সাধারণভাবে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, বিশেষত : শিশু, গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের সেবা করার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। এ ছাড়া জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য রেফারেল সার্ভিসও দেয়া হয়। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় এক ডজনের বেশি বিভিন্ন প্রকারের স্বাস্থ্যসেবা পদান করা হয়।

খ. ***স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি :*** জিআরওভুক্ত পরিবারগুলোর সব সদস্য বিশেষ করে মা ও কিশোরী মেয়েদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়।

গ. ***স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন :*** স্বাস্থ্যসম্মত পয়-নিষ্কাশন বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় সিজেডএম-এর জীবিকা ও ফেরদৌসি কর্মসূচি এলাকায় সদস্যদের উদ্বুদ্ধকরণ ও চাহিদা মাফিক স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা বসিয়ে স্বাস্থ্যসম্মত পয়-নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়।

ঘ. ***বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ :*** দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মক্ষমতা কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ হলো বিশুদ্ধ পানি পান করতে না পারায় পানিবাহিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়া। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় সিজেডএম-এর জীবিকা উন্নয়ন কেন্দ্র এলাকায় চাহিদা মাফিক নলকূপ বসিয়ে বা বিশুদ্ধ পানি সংরক্ষণের কন্টেনার (ট্যাংক) বিতরণ করে অথবা বিশুদ্ধ পানির জন্য ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন করে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়।

চার : শিক্ষা ও পুষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি :

ক. ***গুলবাগিচা শিক্ষা কেন্দ্র :*** সিজেডএম-এর গুলবাগিচা 'প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি' প্রত্যক্ষভাবে শিশুদের জন্য বাস্তবায়ন করা হয়। জিআরও পরিবারের কোনো শিশু যাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষা থেকে

বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করা হয়। চার থেকে ছয় বছরের ২৫-৩০ জন শিশুদের নিয়ে এক একটি 'গুলবাগিচা শিক্ষা কেন্দ্র' এক বছরের জন্য চালু করা হয়। কেন্দ্রের সব শিশুকে বই-পুস্তক খাতাপত্র ও পোশাক ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয়। এ ছাড়া সিজেডএম প্রাথমিক ও মাধ্যমিক আবাসিক বিদ্যালয় পরিচালনা করে থাকে।

খ. ***পুষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি :*** পুষ্টি উন্নয়ন বিষয়টি বিবেচনায় রেখে জীবিকা উন্নয়ন কেন্দ্রের আওতায় পরিচালিত গুলবাগিচা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষালয়ে শিশুদের জন্য উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়। এছাড়া জীবিকা ও ফেরদৌসি প্রকল্প এলাকায় 'পুষ্টি বাগান' তথা ফলদবৃক্ষ ও সবজি চাষের জন্য উন্নত মানের বীজ ও চারা সরবরাহ করা হয়।

গ. ***জীবনঘনিষ্ঠ শিক্ষা কর্মসূচি :*** জীবিকা উন্নয়ন কেন্দ্রের সব সদস্য যাতে পবিত্র কুরআন পড়তে পারে, বুঝতে পারে এবং চর্চা করতে পারে, সেজন্য 'কুরআন শিক্ষা কেন্দ্র' চালু করা হয়। একই সঙ্গে তাদেরকে 'জীবনঘনিষ্ঠ শিক্ষা' দেয়া হয়।

সপ্তম অধ্যায়

দারিদ্র্যবিমোচন কার্যক্রমের সম্ভাব্য সুফল

সিজেডএম-এর অনুসৃত দারিদ্র্যবিমোচন কৌশল ও কার্যক্রমের সম্ভাব্য সুফলকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে : (ক) অর্থনৈতিক উন্নয়ন; (খ) মানব উন্নয়ন; ও (গ.) সামাজিক উন্নয়ন। সম্ভাব্য সুফলগুলো নিম্নরূপ হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে :

ক. অর্থনৈতিক উন্নয়ন

১. মূলধন হস্তান্তরের ফলে দরিদ্র পরিবারগুলোর বিনিয়োগের লক্ষ্যে মূলধনের জন্য কারো কাছে হাত পাততে হবে না।

২. সদস্যদের সঞ্চয় অভ্যাস গড়ে উঠবে এবং তাদের সম্পদ বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

৩. সদস্যরা শরীয়াহসম্মত পদ্ধতিতে তাদের মূলধন বিনিয়োগ করে আয়বর্ধনমূলক কাজে নিয়োজিত হতে পারবে।

৪. সদস্যদের নিজস্ব মূলধনে ঘূর্ণায়মান তহবিল গঠনের ফলে এটি টেকসই তহবিলে পরিণত হবে।

৫. মূলধন বিনিয়োগ করে আয়বর্ধনমূলক কাজে নিয়োজিত হলে স্বাভাবিকভাবেই কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

৬. সবার জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি হলে ভিক্ষাবৃত্তি পেশার সাথে কেউ জড়িত থাকবে না।

৭. মূলধন বিনিয়োগ করে আয়বর্ধনমূলক কাজে নিয়োজিত হবার ফলশ্রুতিতে কেউ কেউ নিজ যোগ্যতার বলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হবে।

৮. সদস্যরা যৌথভাবেও তাদের মূলধন বিনিয়োগ করে বৃহদাকার আয়বর্ধনমূলক কাজে নিয়োজিত হতে পারবে। আবার সমবায় পদ্ধতিতেও ব্যবসায়ে নিয়োজিত হতে পারবে।

৯. সিজেডএম বাজার সংযোগ স্থাপনে সহযোগিতা করলে তারা বেশি পণ্য বিক্রি করতে পারবে। সিজেডএম-এর প্রকল্পগুলোর সদস্যরাই একটি বিরাট বাজারের সদস্য।

১০. সদস্যরা সিজেডএম কর্তৃক প্রদেয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দক্ষতা অর্জন করবে এবং তারা নতুন প্রযুক্তি আয়ত্ত করতে পারবে।

১১. সদস্যরা প্রকল্প শেষে ব্যাংক হিসবে খুলে যাতে তাদের সঞ্চয় জমা ও লেনদেন করতে পারে।

খ. মানব উন্নয়ন :

১. জীবিকা প্রকল্পের সদস্যরা বিশেষত : নারী ও শিশুরা সহজেই স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ পাবে। এতে তাদের ঝুঁকি কমে যাবে।

২. সদস্যদের নিরাপদ পানি পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৩. ফেরদৌসি প্রকল্পের সদস্যরা স্বেচ্ছায় স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন করবে। এতে তাদের রোগ-বালাইয়ের ঝুঁকি কমবে।

৪. শিশুদেরকে গুলবাগিচা কেন্দ্রে পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা হবে; ফলে তারা পুষ্টিহীনতার কবল থেকে মুক্তি পাবে।

৫. সব শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা এবং ক্রমান্বয়ে উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম করে দেয়া হবে।

৬. সব শিশু নিজ নিজ ধর্মের প্রাথমিক ও মৌলিক জ্ঞানলাভ করবে এবং নৈতিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হবে।

গ. সামাজিক উন্নয়ন

১. দলগতভাবে মূলধন নিয়ে ঘূর্ণায়মান তহবিল গঠন, একত্রে ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন, নিয়মিত বৈঠক, ব্যাংক হিসাব পরিচালনা, মুনাফা সমভাবে বণ্টন ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সদস্যদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য গড়ে উঠবে।

২. সদস্যরা বৃক্ষরোপণ, ফলবৃক্ষ ও সবজি চাষ, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন, দুর্যোগ প্রস্তুতি ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়ন ঘটবে।

৩. তৃণমূল সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও জীবিকা উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে কমিউনিটিতে একটি স্থায়ীভাবে কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে।

৪. একই সমিতির সদস্য হওয়ায় তারা একে অপরের কল্যাণে এগিয়ে আসবে।

৫. তৃণমূল সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও জীবিকা উন্নয়ন কেন্দ্রের সদস্য হিসেবে তাদের আত্মবিশ্বাস এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

৬. পরিবারের নারী সদস্যই প্রধানত: তৃণমূল সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও জীবিকা উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রতিনিধিত্ব করে; ফলে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং আয়বর্ধনমূলক কাজে নারী জড়িত থাকায় পরিবারে কলহ কমে যাবে।

৭. তৃণমূল সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও জীবিকা উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে কমিউনিটিতে একটি স্থায়ীভাবে কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার ফলে সামাজিক বিরোধ হ্রাস পাবে।

৮. তৃণমূল সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও জীবিকা উন্নয়ন কেন্দ্রের সদস্যদের মধ্যে ইতিবাচক কাজের মিথস্ক্রিয়া বেশি হওয়ায় তারা প্রত্যেকে পরস্পরের ভালো-মন্দের খোঁজ রাখবে; ফলে তারা মাদকাসক্তি বা অন্যকোন অসামাজিক কাজে সম্পৃক্ত হবে না।

অষ্টম অধ্যায়
জীবিকা কর্মসূচির মূল্যায়ন

জীবিকা কর্মসূচি বাংলাদেশের স্থানীয় অর্থনীতিবিদ এবং উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের দ্বারা অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে। কোনো কোনো জীবিকা প্রকল্প পৃথক গবেষণা সংস্থা দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। জীবিকা কর্ণফুলি প্রকল্পটি 'পাওয়ার এন্ড পারটিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার' (পিপিআরসি)-এর উদ্যোগে দেশের শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদ ড. হোসেন জিল্লুর রহমানের নেতৃত্বে সমীক্ষা পরিচালনা করেছিল।

পিপিআরসি চট্টগ্রামের উপকণ্ঠে অবস্থিত 'জীবিকা কর্ণফুলি' প্রকল্পের উপর দু'টি মূল্যায়ন সমীক্ষা সম্পাদন করে : প্রথমত, প্রকল্পের তিন বছর পরে একটি মধ্যবর্তী জরিপ এবং পঞ্চম বছর শেষ হওয়ার পরে দ্বিতীয়টি। সমীক্ষাটি ১৫৯ টি তৃণমূল সদস্য পরিবারের মধ্যে পরিচালিত হয়েছিল, যার মোট জনসংখ্যা ছিল ১৮৮৯ জন। সমীক্ষাধীন পরিবারগুলোর মধ্যে ৫৯.৭% ছিল শ্রমশক্তির অন্তর্ভুক্ত যেখানে ২৪% সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে। এ ছাড়া ২৭% শিক্ষার্থী, ৭% গৃহিণী এবং ১১% নির্ভরশীল সদস্য ছিল। এ পরিবারগুলোর বেশিরভাগ হস্তশিল্প তৈরি, ছোট ব্যবসা এবং কর্ণফুলি ও হালদা নদীতে মাছ ধরার মাধ্যমে তাদের জীবিকা নির্বাহ করত।

সমীক্ষার ফলাফল :

হোসেন জিল্লুর রহমান (২০১৮) পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, প্রকল্পটি আয়ের স্তরের পাশাপাশি অন্যান্য দিকগুলোর ক্ষেত্রেও খুব উৎসাহব্যঞ্জক ফলাফল দেখিয়েছে। প্রকল্পের সাধারণ প্রভাব নিম্নে তুলে ধরা হয়েছে :

সারণি : জীবিকা কর্ণফুলি প্রকল্পের অর্জন

ক্র : নং	সহায়তার ক্ষেত্র	বেসলাইন পরিস্থিতি (২০১২)	অর্জন (২০১৭)
১.	মাইক্রো-ইক্যুইটি বিতরণ	০০	২০,০০০ টাকা
২.	পারিবারিক সঞ্চয়	০০	১১,৪৬০ টাকা
৩.	মাসিক আয়	৭,৪৬৯ টাকা	১৭,৪১২ টাকা
৪.	সম্পদ আহরণ	০০	৩৫,৮৬৯ টাকা
৫.	বাড়ি ছাড়া অন্য জমির মালিকানা	০.৯৫%	৪.৮%
৬.	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	কোন আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ছিল না	২২১ জন
৭.	উৎপাদনশীল সম্পত্তির মালিকানা	নৌকা -২২%	১০০%
৮.	অন্যান্য সম্পদ : এ : সেল ফোন বি : টেলিভিশন সি : অলংকার	 ৪০% ৩০% ৩২%	 ৮২% ৫৬% ৫৯%
৯.	ঋণের বোঝা	৬০%	০১%
১০.	বসবাসযোগ্য গৃহ	২৮%	৪৮%

ড. রহমানের সমীক্ষার ফলাফলগুলো নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে (রহমান এইচ। জেড।, ২০১৮) :

ক. **ইক্যুইটি ক্যাপিটাল স্থানান্তর :** প্রতিটি জিআরও সদস্যের জন্য ২০,০০০ টাকা সরাসরি তাদের গ্রুপ ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সম্পূর্ণ মালিকানায় স্থানান্তর করা হয়েছিল। জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, জীবিকা প্রকল্পে যোগদানের আগে প্রায় ৬২% সুবিধাভোগী মহাজনদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন এবং ৭৪% মাইক্রোক্রেডিট এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণ করত। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, নির্বাচিত মুস্তাহিকদের নিজস্ব সামান্য কিছু মূলধন ছিল বা

আদৌ ছিল না। নাটকীয় ঘটনা ঘটেছিল যখন প্রায় সবাই তাদের সম্মিলিত মালিকানাধীন যাকাতভিত্তিক আবর্তক তহবিলের সুযোগ পেয়ে যায়। আবার প্রকল্পের মেয়াদ শেষে প্রতিটি পরিবারকে গড়ে ৩৫,০০০ টাকা ফেরত দেয়া হয়। এর মধ্য দিয়ে তারা একটা মূলধনের মালিক হয়ে যায়। অথচ প্রকল্পের শুরুতে তাদের হাত ছিল শূন্য।

খ. **সঞ্চয় ও মূলধন বৃদ্ধি :** তথ্য-উপাত্ত প্রমাণ করেছে যে, আর্থিক অবস্থার উন্নতির সাথে সাথে জিআরও সদস্যরা তাদের সঞ্চয় করার অভ্যাস গড়ে তুলেছে। সঞ্চয় অভ্যাসটি অনুশীলন করে তারা ২০,০০০ থেকে ৩৫,০০০ টাকা পর্যন্ত তাদের মূলধনের (সিজেডএম দেয়া যাকাত) পরিমাণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়।

গ. **আয় বৃদ্ধি :** বিনিয়োগ ব্যবহার থেকে এটা স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, বেশিরভাগ সদস্যই তাদের অর্থ বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে (আইজিএ) বিনিয়োগ করেছে। জরিপের ফল থেকে আরো দেখা যায় যে, প্রকল্পের শুরুতে প্রতিটি পরিবারের গড় আয় ছিল মাত্র ৭,৪৬৯ টাকা। প্রকল্পের পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষে প্রতিটি সদস্যের সর্বনিম্ন উপার্জন প্রতি মাসে সর্বোচ্চ ১৭,৪১২ টাকা (দৃশ্যমান নগদ আয়) পৌঁছে।

ঘ. **উৎপাদনশীল সম্পদ আহরণ :** সদস্যদের দ্বারা উৎপাদনশীল সম্পদ (এসেট) অর্জনের ক্ষেত্রে খুব উৎসাহব্যঞ্জক ফল পাওয়া গেছে। সব সদস্য তাদের ঘূর্ণায়মান তহবিলে সহজ অভিগম্যতা এবং বিনিয়োগ ফেরত প্রদানে নমনীয়তার জন্য গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেছে যা তাদের জীবিকার জন্য ব্যবসায়ের মূলধন এবং উৎপাদনশীল সম্পদ সংগ্রহে ব্যাপক অবদান রেখেছে।

ঙ. **দক্ষতা বিকাশ :** দক্ষতা এবং আর্থিক সক্ষমতা উন্নয়নের সাথে ১১৬২ জন সদস্য ছোট ছোট স্কেলের নিজস্ব ব্যবসায়ে উদ্যোক্তা হয়েছেন। প্রশিক্ষণের ফলে এবং দলীয় দায়বদ্ধতার ফলে জিআরও সদস্যরা তাদের পরিচালন ক্ষমতা অনেকাংশে উন্নত করেছে। তৃণমূল দলের নেতাদের পরিচালনার দক্ষতাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। জরিপের ফলাফলে আরো দেখা

যায় যে, ১০০% জিআরও নেতারা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছে।

চ. **শিশুদের শিক্ষা ও পুষ্টি :** তৃণমূল সদস্যদের শিশুদের শিক্ষায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। শিশুরা স্কুলে যায় না এমন কোনও পরিবারই খুঁজে পাওয়া যায়নি। এটা ইঙ্গিত দেয় যে, স্কুলে বাচ্চাদের ১০০% তালিকাভুক্তি হয়েছে। বাচ্চাদের চিন্তাভাবনা এবং মনোভাবের উপর ধর্মীয় শিক্ষার ভালো প্রভাব পড়েছে। বেশিরভাগ প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যরা নিয়মিত বুনিয়াদি ইবাদাত অনুশীলন করে। বছরের ৭০ দিন অর্থাৎ সপ্তাহে তিনদিন বাচ্চাদের মধ্যে পুষ্টিকর খাবার বিতরণ করা হয়েছিল যা তাদের পুষ্টির অবস্থার উন্নতি করে।

ছ. **স্বাস্থ্যসেবা :** জিআরও সদস্যদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এবং বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহের জন্য একজন প্যারামেডিক এবং একজন মেডিকেল ডাক্তার দিয়ে সজ্জিত একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল। যাকাতপ্রাপক পরিবারগুলোর জন্য স্বাস্থ্য কার্ড প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রকল্পের আওতাধীন সমস্ত পরিবারের প্রাথমিক চিকিৎসার প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছিল। পর্যায়ক্রমিক চেকআপ এবং পরামর্শদানের সুবিধার ফলে গর্ভবতী এবং প্রসূতি মায়েদের জটিলতা হ্রাস পেয়েছে। গ্রুপের সদস্যদের পাশাপাশি সিজেডএম কর্মীরা যেমন জানিয়েছেন, একজন মাও সেবাযত্ন ও চিকিৎসা পরিষেবার বাইরে ছিলেন না। কিশোরী মেয়েদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বেড়েছে। পানিবাহিত রোগের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। সাধারণ রোগ যেমন, মৌসুমী জ্বর, কাশি, আমাশয় এবং কখনও কখনও খাদ্য বিষক্রিয়ার জন্য ডায়রিয়ার প্রবণতা দেখা গেছে।

জ. **বিশুদ্ধ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা :** জরিপে দেখা গেছে যে, জীবিকা প্রকল্পের শতকরা ১০০% ভাগ পরিবার বিশুদ্ধ পানি পান করে। প্রায় সবার বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা রয়েছে। অনেকের বাড়ি উন্নত হয়েছে।

ঝ. **কর্মমুখী প্রশিক্ষণ :** প্রায় সবাই উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেয়ে কাজের দক্ষতা বাড়িয়েছে। এর ফলে উৎপাদন বেড়েছে।

ঞ. **ঝুঁকি মোকাবিলা :** সিজেডএম-এর একটি ব্যতিক্রমী উদ্ভাবন হচ্ছে রোগ-বালাই বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে আয়বৃদ্ধিমূলক বিনিয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করা।

ট. **খাদ্য সহায়তা :** জিআরও সদস্যদের মধ্যে এমন পরিবারও ছিল যাদের উপার্জনের কোনো সামর্থ্য নেই। এসব ঝুঁকির মধ্যে থাকা পরিবারগুলোকে খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়েছে।

ঠ. **অতিরিক্ত প্রভাব :** জরিপ প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে. জিআরও সদস্যরা জীবিকা কর্মসূচির সুফল লাভের বাইরের অতিরিক্ত কিছু সুবিধা পেয়েছে, যথা - (১) নারীর ক্ষমতায়ন : জীবিকা প্রকল্পের সদস্য পরিবারগুলোর ৯০% নারীই দলে প্রতিনিধিত্ব করেছে। তারাই সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে তারাই অগ্রাধিকার পেয়েছে।

ড. **সব সম্প্রদায়ের জন্য সমান সুযোগ :** প্রকল্প এলাকায় ১২০ টি সংখ্যালঘু সদস্য পরিবার ছিল যাদেরকে সমপরিমাণ সাদাকাহ/অনুদান দেয়া হয়েছে। তারা সবই ছিল জেলে পরিবার। তাদের এখন নিজস্ব নৌকা ও জাল হয়েছে। তাদের জীবনমানের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে।

ঢ. **সামাজিক সম্প্রীতি :** জিআরও সদস্যদের মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক সম্প্রীতিও বৃদ্ধি পেয়েছে; কারণ তারা মনে করে, ঐক্যবদ্ধ থাকার মধ্যেই তাদের কল্যান নিহিত রয়েছে।

ঞ. **ধর্মীয় মূল্যবোধের উন্নয়ন :** জীবিকা সদস্যদের মধ্যে নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধেরও উন্নয়ন ঘটেছে।

আর্থিক ক্ষমতায়নে রূপান্তরকামী মডেল

ড. হোসেন জিল্লুর রহমান তাঁর সমীক্ষার উপসংহারে মন্তব্য করেন যে, জীবিকা কর্ণফুলি মোহরা প্রকল্প আর্থিক ক্ষমতায়নের একটি নতুন মডেল পেশ করেছে যা যাকাত অনুদানের উপর ভিত্তি করে 'ইক্যুইটি ক্যাপিটাল' নামের পুরোপুরি একটি নতুন কর্মসূচি চালু করেছে। ত্রিশ সদস্যের তৃণমূল

সংগঠন (জিআরও)-এর উপর মনোনিবেশের ফলে হতদরিদ্রদের সামাজিক প্রয়োজনের লক্ষ্যে সহায়ক পুনঃতফসিল সংস্কৃতি এবং সমান্তরাল অন্যান্য কার্যক্রম সবমিলিয়ে মডেলটি 'আর্থিক ক্ষমতায়নের নতুন এবং সম্ভাব্য রূপান্তরকামী মডেল' হিসেবে গণ্য করা যায়। (রহমান জেডআর, ২০১৮)। ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ মডেলটি ৬০ টি জীবিকা প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

উপরে উল্লেখিত সাফল্যের গল্পগুলো কেবল জীবিকা কর্ণফুলির সাথেই সম্পর্কিত ছিল না, অন্য প্রকল্পগুলো থেকেও কমবেশি অনুরূপ ফলাফল প্রকাশ পেয়েছে। জীবিকা প্রকল্পগুলোর সাফল্যের কাহিনী থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, সিজেডএম অনুসৃত কৌশলগুলো যাকাতভিত্তিক জীবিকা প্রকল্পের কার্যকারিতা দৃঢ়ভাবে প্রতীয়মান হয়েছে।

মূলত : জিল্লুর রহমান জীবিকা কর্মসূচি সমীক্ষা করে এমন তিনটি দিক চিহ্নিত করেছেন যা মডেলটির টেকসই হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত দেয় যেমন : (ক) আর্থিক ক্ষমতায়নের নতুন মডেল হিসেবে 'ইক্যুইটি মূলধন' সরবরাহ; (খ) স্থিতিশীলতার জন্য কর্মসূচিটিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা ; এবং (গ) প্রকল্প শেষে 'সংযোগ' ক্ষমতা ধরে রাখা (রহমান এইচ জেড, ২০১৮)

প্রথমত, মুস্তাহিক পরিবারকে 'ইক্যুইটি ক্যাপিটাল' সরবরাহ করা দারিদ্র্য বিমোচনের প্রচলিত আর্থিক সহায়তার তুলনায় একটি অসাধারণ ব্যবস্থা। দলীয় 'ঘূর্ণায়মান তহবিল' থেকে সহজে বিনা সুদে মূলধন পাওয়া এবং তা পরিশোধের উদার সংস্কৃতি পুরো প্রক্রিয়াটিকে আরও টেকসই করে তোলে।

দ্বিতীয়ত, একদিকে যাকাতের মাধ্যমে নির্মিত 'ইক্যুইটি ক্যাপিটাল' সহ প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের নিয়ে জীবিকা প্রকল্পের আওতায় জিআরও গঠন এবং অন্যদিকে এর থেকে প্রবাহিত ঘূর্ণায়মান তহবিল অপারেশনটি পরিবর্তনের অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। পর্যায়ক্রমে প্রকল্প চক্রের পরিধি (অর্থাৎ প্রকল্পের সূচনা- ছয় মাস, নমনীয়তার সময়কাল তিন বছর এবং সমাপ্তি পর্ব দেড় বছর) একটি সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসার প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত বাস্তবসম্মত বলে বিবেচনা করা যায়। এ ছাড়া, জিআরও সদস্যদের জন্য টেকসই বাহন

হিসেবে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিষেবা অব্যাহত রাখা একটি শক্তিশালী উপকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তৃতীয়ত, জীবিকা কর্মসূচি একই সঙ্গে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, পুষ্টি বিকাশ, স্যানিটেশন এবং নিরাপদ পানি ইত্যাদিতে পরিপূরক সহায়তা প্রদান করে যা একটি কার্যকর কৌশল হিসেবে কাজ করে।

চতুর্থত, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যেখানে দারিদ্র্য বিমোচনের সব প্রকল্প এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পুরোপুরি দাতাদের তহবিল বা সরকারি বরাদ্দের উপর নির্ভরশীল, সেখানে সিজেডএম-এর তহবিল স্থানীয় ধর্মীয় দাতব্য উৎস থেকে আসে। সুতরাং, সিজেডএম-এর মতো দাতব্য সংস্থাগুলোর স্থানীয় তহবিলের প্রবাহ কখনই শেষ হবে না। কিছু শীর্ষস্থানীয় কর্পোরেট হাউস সিজেডএম-এর কৌশলগত অংশীদারিত্বের সাথে জড়িত রয়েছে যা 'দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কর্পোরেট উদ্যোগ' (সিজেডএম, ২০১৮) নামে পরিচিত।

পঞ্চমত, সিজেডএম ইতোমধ্যে যাকাত ব্যবস্থাপনায় এক যুগের বেশি সময়ের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে এবং বিশেষত বিভিন্ন দারিদ্র্যবিমোচন প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে। জীবিকা মডেলটি সিজেডএম দ্বারা সূচিত একটি উদ্ভাবনী ধারণা এবং এটি প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে তৈরি করা হয়েছিল এবং তারপরে দেশের বিভিন্ন স্থানে হুবহু বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। যাকাত এবং দাতব্য তহবিল ব্যবহার করে দারিদ্র্য বিমোচনের মডেলটির ধারণাটি এক বৃহত্তর পর্যায়ে পৌঁছেছে। কবীর হাসান মন্তব্য করেছেন যে, বাংলাদেশের মাটি থেকে কোটি কোটি ডলারের যাকাত সম্পদ আহরণের সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং, জীবিকা কর্মসূচিটি সম্প্রসারণে তহবিলে কোনো সমস্যা হবে না (হাসান কে ২০০৩)।

সম্পদের সহজলভ্যতা একাই প্রকল্পের কার্যকারিতার গ্যারান্টি দিতে পারে না। দক্ষ ও জ্ঞানসম্পন্ন জনবল মোতায়েন না করে (আমীল, যাকাতের ক্ষেত্রে) ইতিবাচক ফলাফল অর্জন করা খুব কঠিন।

সিজেডএম যাকাতভিত্তিক প্রকল্পটির বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ নিয়ে আমীলের একটি দল সফলভাবে গড়ে তুলেছে।

পিপিআরসি'র সমীক্ষার বাইরে অন্যান্য কয়েকটি প্রকল্প মূল্যায়ন করে প্রায় একই ধরনের ফল পাওয়া গেছে। সিজেডএম পরিচালিত জিনিয়াস বৃত্তি কর্মসূচির আওতায় শত শত শিক্ষার্থী নির্বিঘ্নে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারছে। গুলবাগিচা কর্মসূচির আওতায় হাজার হাজার দুঃস্থ ও গরিব শিশু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পাচ্ছে। নৈপূণ্য বিকাশ কর্মসূচির আওতায় শত শত বেকার যুবক ও যুবমহিলা কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ পেয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারছে। ফেরদৌসি কর্মসূচির আওতায় হাজার হাজার দুঃস্থ ও গরিব নারী ও শিশু বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে।

সুতরাং যুক্তিসঙ্গতভাবেই মনে করা যেতে পারে যে, সিজেডএম যে কৌশল ও পদ্ধতি অবলম্বন করে যাকাত তহবিল দিয়ে দারিদ্র্যবিমোচন ও মানব উন্নয়নে কাজ করছে তা কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে।

উপসংহার

যাকাত যে দারিদ্র্য বিমোচনের একটি কার্যকর ব্যবস্থা হতে পারে এবং আমাদের সমাজে বিপুল পরিমাণ যাকাত রাজস্ব সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে, সে সম্পর্কে সমাজকর্মী, গবেষক, নীতি-নির্ধারকরা খুব একটা সচেতন নন। এমনকি ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠানগুলোও বিষয়টি বাস্তবে খুব একটা প্রয়োগ করে দেখেননি। সিজেডএম-এর যাকাত বিতরণের কৌশল ও পদ্ধতি থেকে আগ্রহীরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারেন। এরূপ আরো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, যাকাত সম্পর্কে জ্ঞান ও বাস্তবায়ন কৌশলের মধ্যে ব্যবধান থাকায় যাকাত থেকে কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।

আশার কথা হচ্ছে, বিশ্বব্যাপী 'ফেইথ-বেইজড' (Faith-based) উন্নয়ন কৌশল ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। এখন প্রয়োজন হচ্ছে দক্ষ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক যাকাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং নিয়মিত গবেষণার মাধ্যমে মানব কল্যাণে কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূর করার জন্য যাকাত বিতরণের মাধ্যমে ধনীদের সম্পদের নির্ধারিত অংশ অর্থাৎ শতকরা আড়াই ভাগ দরিদ্রদের কাছে সম্পদ হিসেবে হস্তান্তর করে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ করে দিতে হবে। তাদের সুপ্ত প্রতিভাকে কাজে লাগানোর জন্য তাদের দক্ষতাকে বৃদ্ধি করতে হবে এবং এভাবে তাদেরকে সমাজের এক কর্মক্ষম ও সৃজনশীল জনশক্তিতে পরিণত করতে হবে।

বস্তুতঃ যাকাতের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। এজন্য প্রয়োজন দেশের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, আলেম, উন্নয়ন কর্মী ও গবেষকদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা। এক্ষেত্রে দেশের করপোরেট যাকাত দাতাদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। তারা যদি সম্মিলিতভাবে কাজ করেন তা হলেই কেবল যাকাতকে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর কাজটি সহজ হবে। এজন্য আরো দরকার একদল নিবেদিতপ্রাণ জনবল (আমেলীন) যারা পেশাগত দক্ষতা ও উন্নত নৈতিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে কাজ করবে।

সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট-এর এই মহান প্রয়াসে আপনিও শরিক হতে পারেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপনাকে যে সম্পদ দান করেছেন এবং যে সম্পদ আপনাকে আমানত হিসেবে দেখাশুনার জন্য দেয়া হয়েছে তার যথাযথ ব্যবহার করা আপনার একান্ত কর্তব্য। নচেৎ পরকালে এজন্য কঠোরভাবে জবাবদিহি করতে হবে।

আসুন, আমাদের প্রিয় দেশটির হতভাগ্য মানুষের পাশে দাঁড়াই; তাদের দুঃখ-দুর্দশা উপলব্ধি করার চেষ্টা করি এবং সুপরিকল্পিত কর্মসূচি গ্রহণ করে দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখি। আপনার প্রদত্ত যাকাতের কিছু অর্থ দিয়ে যদি একটি শিশু শিক্ষা লাভ করে বা একটি নারী উপযুক্ত মা হতে পারে বা একটি পরিবার সচ্ছলতার মুখ দেখতে পারে বা একটি যুবক গ্রাজুয়েট হতে পারে তাহলে আপনি যেমন পরিতৃপ্তি পাবেন, তেমনি আপনি বিচার দিনেও পুরস্কারের আশা করতে পারেন। আমিন!

পরিশিষ্ট-ক
যাকাতের বিধি-বিধান

যাকাত আদায়ের বিধান

যাকাতের 'নিসাব' হলো ন্যূনতম সেই পরিমাণ সম্পদ, যার মালিকানার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ওপর যাকাত ফরয হয়। কোনো ব্যক্তির আর্থিক সামর্থ্যের ভিত্তিতেই ব্যক্তির ওপর রাষ্ট্রীয় ট্যাক্স আরোপিত হয় এবং তদনুসারেই এর পরিমাণ নিরূপণ করা হয়। অনুরূপভাবে, ইসলামী আইনে কোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন সম্পদের পরিমাণের ভিত্তিতেই কোনো ব্যক্তির উপর যাকাত নিরূপিত হয়। কোনো ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত একটি ন্যূনতম নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের মালিক না হোন, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তির ওপর যাকাত পরিশোধ করা অপরিহার্য নয়। শরী'য়াহ আইনে ঐ ন্যূনতম নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদকে 'নিসাব' বলা হয়। উক্ত ন্যূনতম নির্ধারিত বা ততোধিক পরিমাণ সম্পদের মালিককে যাকাত আদায়ের মাধ্যমে তার সম্পদ গরিব ও অভাবীদের সাথে ভাগাভাগি করে নেয়ার উপযুক্ত সম্পদশালী ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়।

যাকাত প্রযোজ্য হয় এমন সম্পদগুলো হলো :

১. অলঙ্কার : স্বর্ণ ও রূপার অলংকার। স্বর্ণ-রূপা ব্যতীত অন্যান্য মূল্যবান বস্তু। যেমন হীরা, ইয়াকুত, মোতি, মুক্তাদানা, গোমেদ-পীতবর্ণ মণিবিশেষ ইত্যাদি যদি ব্যবসায়ী পণ্য হিসেবে বিবেচিত হয় তবে তার যাকাত আদায় করতে হবে।

২. নোট ও মুদ্রার যাকাত : ব্যাংক নোট অর্থাৎ টাকা, ডলার, পাউন্ড, ইউরো, রিয়াল ও অন্যান্য মুদ্রা যা নগদ অর্থ হিসেবে পরিচিত।

৩. ব্যবসা ও শিল্প পণ্য : সব ধরনের ব্যবসায়িক পণ্য।

৪. চতুষ্পদ প্রাণী : উট, গরু/মহিষ ও ছাগল/দুম্বা/ভেড়ার যাকাত।

৫. ফল ও ফসল : যেসব ফল ও ফসল খাদ্য ও সঞ্চয় করার উপযুক্ত এবং ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করলে নষ্ট হয় না এমন ফসলে যাকাত ফরজ হবে।

১. স্বর্ণ ও রৌপ্যে যাকাতের নিসাব

ক. স্বর্ণের যাকাত নিসাব

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'বিশ দিনারের কম স্বর্ণে যাকাত ফরয নয়।' (সুনান আবূ দাউদ)। যার আধুনিক পরিমাণ, ৮৫ গ্রাম বা ৭.৫ ভরি স্বর্ণ। অর্থাৎ উল্লিখিত পরিমাণ স্বর্ণ অথবা এর সমমূল্য পরিমাণ সম্পদ কারো নিকটে এক চান্দ্রবছর যাবৎ থাকলে তার ওপর বর্তমান বাজার মূল্যের হিসাবে মোট সম্পদের ২.৫০% হারে যাকাত দেয়া ফরয।

খ. রূপার যাকাত নিসাব

রূপার নিসাব উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণ রৌপ্যে যাকাত নেই'। (সহিহ আল-বুখারী) উল্লেখ্য, হাদিসে বর্ণিত ২০০ দিরহাম সমান ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্য বা ৫২.৫ তোলা/ভরি রৌপ্য। উক্ত পরিমাণ রৌপ্য-এর সমমূল্য পরিমাণ সম্পদ কারো নিকটে এক চান্দ্রবছর যাবৎ থাকলে তার ওপর বর্তমান বাজার মূল্যের হিসাবে মোট সম্পদের ২.৫০% যাকাত আদায় করা ফরয।

গ. স্বর্ণ ও রৌপ্য একত্রিত করে যাকাত প্রদান

কারো নিকটে স্বর্ণ ও রৌপ্য পৃথকভাবে কোনোটিই নিসাব পরিমাণ নেই। তবে যদি স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়টির মূল্যমান নগদ অর্থে হিসাব করলে এককভাবে স্বর্ণ বা রৌপ্যের যাকাতের সমান হয়ে যায়, তবে তার ওপর যাকাত ফরয হবে। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তির ৫৯৫ গ্রাম অপেক্ষা কম রৌপ্য থাকে এবং তার যদি নিসাব-এর বাকি অংশ পূর্ণ করার মতো সোনা বা নগদ অর্থ না থাকে তাহলে তার ওপর যাকাত আদায় করা ফরয হবে না। তবে তাঁর কিছু স্বর্ণ ও কিছু রৌপ্যের মূল্য যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে তার ওপর ২.৫% হারে যাকাত আদায় করতে হবে।

ঘ. ব্যবহৃত অলঙ্কারের যাকাত

ব্যবহৃত অলঙ্কারের যাকাত প্রদান করতে হবে কি-না, এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। তবে অধিকাংশ আলেমের মত হলো, নারীর ব্যবহৃত অলঙ্কারে যাকাত ফরয। এক হাদীসে বলা হয়েছে, 'এক মহিলা তার কন্যাসহ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকটে আসলেন। তার কন্যার হাতে মোটা দু'টি স্বর্ণের বালা ছিল। রাসূল (সা.) তাকে বললেন, তুমি কি এর যাকাত দাও? মহিলাটি বললেন, না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমি কি পছন্দ করো যে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা এর পরিবর্তে তোমাকে এক জোড়া আগুনের বালা পরিধান করাবেন? (সুনান আবূ দাউদ)। এ হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, ব্যবহৃত হোক বা অব্যবহৃত, স্বর্ণ ও রৌপ্য নিসাব পরিমাণ হলে অবশ্যই যাকাত দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, পুরুষের জন্য স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করা হারাম। এরপরও কোনো পুরুষ যদি স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করে তবে তাকেও উক্ত অলঙ্কারের যাকাত প্রদান করতে হবে।

২. নোট ও মুদ্রার যাকাত

টাকা বা মুদ্রার নিসাবের মানদণ্ড স্বর্ণের নিসাবের মানদণ্ডে না ধরে রূপার নিসাবের মানদণ্ডে হিসাব করাই উত্তম। অর্থাৎ ব্যাংক নোট, চেক ও অন্যান্য ডকুমেন্টের মূল্য যদি ৫৯৫ গ্রাম বা ৫২.৫ তোলা রূপার মূল্য বরাবর হয় তার ওপর যাকাত ফরয হবে। এভাবে যাকাত দেয়া উত্তম কয়েকটি কারণে :

ক. রূপার নিসাবের পরিমাণ স্বর্ণের নিসাবের অপেক্ষা অনেক কম। এমতাবস্থায়, স্বর্ণ বা রূপার কোনটির মূল্যের ভিত্তিতে যাকাত ফরয হয়েছে তা নিয়ে যেহেতু মতপার্থক্য রয়েছে, সেহেতু সতর্কতা ও দায়-মুক্তির বিবেচনায় রূপার মূল্যের ভিত্তিতে যাকাত প্রদান করা যুক্তিসঙ্গত।

খ. রূপার নিসাবের পরিমাণ মূল্যকে যাকাতের মানদণ্ড নির্ধারণ করা হলে গরিবদের উপকার হয়। কারণ স্বর্ণ অপেক্ষা রূপার মূল্য কম। রূপার নিসাবে যাকাত হিসাব করলে যাকাত দানকারীর সংখ্যা বাড়বে, ফলে গরিবরা উপকৃত হবে।

৩. ব্যবসা ও শিল্পপণ্যের যাকাত

ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত সব ধরনের সম্পদই ব্যবসায়িক পণ্য এবং এগুলোর যাকাত প্রদান করা ফরয। যাকাতযোগ্য বিবেচিত ব্যবসায়িক পণ্য :

ক. হাউজিং ব্যবসার জন্যে ক্রয়কৃত জমি, প্লট, ভবন, অ্যাপার্টমেন্ট ইত্যাদি ব্যবসায়ী সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এগুলোর যাকাত প্রদান আবশ্যক।

খ. বিক্রির উদ্দেশ্যে খামারে পালিত মৎস্য, হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল ইত্যাদি এবং খামারে উৎপাদিত দুধ, ডিম, ফুটানো বাচ্চা, মাছের রেণু-পোনা ইত্যাদি ব্যবসায়ী সম্পদ হিসেবে পরিগণিত।

গ. বিক্রির উদ্দেশ্যে পরিপালিত নার্সারির বীজ, গাছের চারা, কলম ইত্যাদিও ব্যবসায়ী সম্পদ হিসেবে যাকাতযোগ্য।

ঘ. ভাড়ায় নিয়োজিত ঘর-বাড়ি, দালান-কোঠা ইত্যাদির বার্ষিক ভাড়া বাবদ উপার্জিত নিট আয়ের ওপর যাকাত প্রযোজ্য।

কোম্পানির যাকাতের নীতিমালা

ক. কোম্পানির মোট অর্থের যাকাত কোম্পানির পক্ষ থেকে দিতে হবে। এতে কোম্পানিতে বিনিয়োগকৃত সবার অর্থের অংশ হারে যাকাত দেয়া হয়ে যাবে। ব্যক্তিগত যাকাত হিসাব করার সময় এ অংশ বাদ দিতে হবে।

খ. প্রত্যেকে যাকাত দেয়ার সময় কোম্পানি থেকে নিজের অংশের স্থিতি (balance) জেনে নেবেন এবং নিজের অন্যান্য অর্থসম্পদের সাথে মিলিয়ে হিসাব করে যাকাত প্রদান করবেন।

গ. কোম্পানির যাকাত ক্যালকুলেশনের সময় স্থায়ী সম্পদ (fixed assets) ছাড়া অন্য সব ধরনের সম্পদ যাকাত হিসাবের আওতায় আসবে।

ঘ. ব্যবসা-বিনিয়োগের ঋণের ক্ষেত্রে ততটুকুই দায় (liability) হিসেবে পরিগণিত হবে যতটুকু একান্তই ব্যবসায়িক পণ্যের ক্ষেত্রে

ব্যবহার করা হয়েছে। কোম্পানির স্থায়ী সম্পদ (fixed assets) বাড়াতে গৃহীত ঋণ দায় হিসেবে দেখানো যাবে না।

ঙ. প্রক্রিয়াধীন ব্যবসায়ী পণ্য এবং পণ্য নির্মাণে ব্যবহৃত সব কাঁচামালের ওপর যাকাত প্রযোজ্য।

চ. যৌথ মালিকানাধীন কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM)-এ বিনিয়োগকারীদের যাকাত কোম্পানি প্রদান করবে– অথবা মালিক তার অংশের যাকাত নিজে আদায় করবে এরূপ রেজুলেশন গ্রহণ করতে হবে।

শেয়ারের যাকাত

শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে কোম্পানির অংশীদার হয়ে মুনাফা অর্জন করা। প্রথমত, কোম্পানি ব্যবসায় মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে। যেমন- কোম্পানি কল-কারখানা স্থাপন করতঃ পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করে বাজারজাত ইত্যাদির মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে। এমন কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করলে যাকাতের বিধান হল, যে পরিমাণ অর্থ স্থায়ী সম্পদ (Fixed Assets) স্থাপনে ব্যবহৃত হয়েছে, তা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট মূলধন, উৎপাদিত দ্রব্য ও অর্জিত মুনাফার যাকাত দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, কোম্পানি মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে কোনো পণ্য ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা করে না, বরং ক্রয়কৃত পণ্য ইত্যাদি ভাড়া দিয়ে মুনাফা অর্জন করে। এমন কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করলে, তার যাকাতের বিধান হল, শেয়ারের মূলধনের উপরে যাকাত আসবে না, বরং তা থেকে অর্জিত মুনাফার উপরে যাকাত আসবে। যেমন- কোম্পানির দোকান, ভবন, বাস-ট্রাক, সিএনজি, ট্যাক্সি ইত্যাদি ভাড়া দিয়ে মুনাফা অর্জন করে। তৃতীয়ত : শেয়ারে ব্যবসা করে মুনাফা অর্জন করা। অর্থাৎ শেয়ারের দরপতন লক্ষ্য করে শেয়ার ক্রয় করা, আবার যখন উক্ত শেয়ারের দর বৃদ্ধি পায়, তখন তা বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করা। এ প্রকার শেয়ারের যাকাত আদায়ের পদ্ধতি হল, যাকাত ফরয হওয়ার 'নির্দিষ্ট দিনে' উক্ত শেয়ারের যে বাজার মূল্য হবে, তা হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।

বিভিন্ন প্রকার বন্ডের যাকাত

বিভিন্ন ধরনের বন্ড হলো এমন একটি প্রত্যয়নপত্র যা ইস্যুকারী এর বাহককে গায়ে লেখা মূল্য (ফেস ভ্যালু) প্রদান করতে বাধ্য থাকে যখন সে তার হকদার হয়। সাথে সাথে বন্ডের মূল্যের সাথে চুক্তি মোতাবেক অতিরিক্ত লাভও প্রদান করা হয়। এটি পরিষ্কার সুদ ও হারাম।

বন্ডের যাকাতের হুকুম ঋণের যাকাতের মতোই। নিসাব পরিমাণ হলে এতে যাকাত ফরয হবে। অথবা বন্ডধারী ব্যক্তির অন্যান্য সম্পদ, যেমন টাকা-পয়সা, ব্যবসায়িক পণ্য ইত্যাদি একসাথে মিলে যদি নিসাব পরিমাণ হয় এবং একবছর অতিবাহিত হয়, তাহলে তাতে যাকাত ফরয হবে। আর যদি বন্ড এমন হয় যা সুনির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে ভাঙানো যাবে না, এমতাবস্থায়ও যাকাত রহিত হবে না, বরং যখন ভাঙানো যাবে তখন বিগত সব বছরের যাকাত প্রদান আবশ্যক হবে।

গায়ে লেখা মূল্য (ফেস ভ্যালু) প্রদান করে কেউ প্রাইজবন্ড ক্রয় করে থাকলে এবং তা তার কাছে এক বছর জমা থাকলে তার ওপর তাকে যাকাত দিতে হবে। কারণ, প্রাইজবন্ড নগদ টাকার মতই যা যে কোনো সময় ভাঙ্গানো যায়।

ভূমির যাকাতের নীতিমালা

ভূমির যাকাতযোগ্যতার বিষয়ে নিম্নোক্ত বিধান প্রযোজ্য। যথা :

ক. ভবিষ্যতে নিজের আবাসন নির্মাণ অথবা সন্তানদের জন্য সম্পদ হিসাবে ক্রয়কৃত ভূমি। এ ধরনের জমির কোনো যাকাত আসবে না।

খ. ভবিষ্যতে ঘর বা মার্কেট দোকান ইত্যাদি নির্মাণ করে ভাড়া দেয়ার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত ভূমি। এ প্রকার ভূমি ওপরও যাকাত আসবে না। তবে প্রাপ্ত ভাড়া থেকে যাকাত আদায় করতে হবে।

গ. ফসল উৎপাদনের জমির ওপরও যাকাত হবে না। তবে উৎপাদিত ফসলের শরীয়াহ মোতাবেক উশর (যাকাত) দিতে হবে।

ঘ. ব্যবসার নিয়াতে ক্রয়কৃত ভূমি মাত্রই যাকাতযোগ্য।

ঙ. ব্যবসায়িক ভূমি কোনো কারণে বছরপূর্তিতে যদি বিক্রি করা না হয় তাহলে যখনই উক্ত জমি বিক্রি হবে তখনই পূর্বের বছরসমূহের যাকাত আদায় করতে হবে।

চ. ক্রয়কৃত ভূমির ওপর বিল্ডিং নির্মাণ করে ফ্ল্যাট হিসাবে সে বিল্ডিং বিক্রি করে দেয়ার ব্যবসা রয়েছে। এ প্রকারের ভূমি ও বিল্ডিং এর দামের ওপর প্রতি বছর যাকাত দিতে হবে।

৪. গবাদি-পশুর যাকাত

বিভিন্ন প্রকারের পশুর মধ্যে ইসলামী শরীয়াহ কেবল গৃহপালিত পশুর যাকাত ফরয করেছেন। যাকাত আবশ্যক এমন হলো গৃহপালিত পশু : যেমন- উট, গাভী, মহিষ, বলদ, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা প্রভৃতি। তবে পাখি, মুরগি, খরগোশ ও অন্যান্য প্রাণীতে যাকাত নেই, তার সংখ্যা যত বেশিই হোক। অবশ্য ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে গৃহীত ডেইরি, পোল্ট্রি ও মৎস্য খামারের ওপর যাকাত প্রযোজ্য হবে।

পশুর যাকাতযোগ্যতার জন্য শর্তাবলি নিম্নরূপ :

ক. নিসাব পরিমাণ হওয়া; নিসাবের জন্য ইসলামী শরীয়াহ পশুর একটি সর্বনিম্ন সংখ্যা নির্ধারণ করে দিয়েছে। ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা ৪০ টি, গরু, মহিষ ৩০ টি এবং উট ৫ টি। উপরোল্লেখিত সংখ্যা হতে পশুর সংখ্যা কম হলে তাতে যাকাত ফরয হবে না।

খ. চান্দ্রবর্ষ হিসেবে এক বছর পূর্ণ হওয়া : গবাদিপশু পূর্ণ এক চান্দ্র বছর ব্যক্তির মালিকানায় থাকতে হবে।

ডেইরি, পোল্ট্রি ও মৎস্য খামারের যাকাতের মূলনীতি

ক. ফার্মের গবাদিপশু দুগ্ধ, ঘি, মাখন, পনির ইত্যাদি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে পালিত হলে এসব পশু পণ্য উৎপাদক পর্যায়ভুক্ত। তাই এসবের যাকাত দিতে হবে না। তবে উৎপন্ন দ্রব্যের যাকাত দিতে হবে।

খ. পশু মোটা তাজা করে বিক্রির জন্য পালিত হলে তার যাকাত দিতে হবে।

গ. পোল্ট্রি ফার্মের হাঁস-মুরগি যদি ডিম বিক্রি বা বাচ্চা ফোটানোর জন্য পালিত হয় তবে হাঁস-মুরগির যাকাত দিতে হবে না, বরং ডিম বা বাচ্চার যাকাত দিতে হবে।

ঘ. বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পোল্ট্রি ফার্মের ব্রয়লার/বাচ্চা উৎপাদন বা লালন পালন করলে এসব পণ্যের যাকাত দিতে হবে।

ঙ. মৎস্য খামারে রেণু বা পোনা বিক্রির জন্য পালিত মাছের যাকাত দিতে হবে না, তবে রেণু বা পোনার যাকাত দিতে হবে।

চ. ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে মৎস্য চাষ করলে তার যাকাত দিতে হবে, তবে শুধু পরিবারের খাবারের জন্য চাষকৃত মাছের যাকাত দিতে হবে না।

ছ. যেসব গবাদিপশু পালন বা মাছ চাষ করা হয় মৌলিকভাবে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ব্যবহারের জন্যে, সেগুলোতে যাকাত প্রযোজ্য হবে না।

৫. উশর বা শস্য-ফসল ও ফলের যাকাত

'উশর' শব্দটি আরবি 'আশারাতুন' (দশ) শব্দ হতে এসেছে। এর শাব্দিক অর্থ এক দশমাংশ। পারিভাষিক অর্থে উৎপাদিত শস্যের দশ ভাগের একভাগ এবং কোনো কোনো ভূমির ক্ষেত্রে বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে নির্ধারিত হকদারকে দিয়ে দেয়াকে 'উশর' বলে। অন্যান্য সম্পদের ন্যায় ফল-ফসলের যাকাত প্রদান করাও ফরয। আল্লাহ তা'আলা বলেন- 'হে মুমিনগণ, তোমরা যা উপার্জন করো এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করি, তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা (যাকাত হিসাবে) ব্যয় করো (সূরাহ আল বাকারাহ্- ২ :২৬৭)।

নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'আকাশের পানি, ঝর্ণা-খাল অথবা জমির আর্দ্রতা দ্বারা চাষ করা জমির উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ, আর সেচের পানি দ্বারা জমির উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশের অর্ধেক তথা বিশ ভাগের একভাগ যাকাত/উশর দিতে হবে।' (সুনানে আবু দাউদ)

উশরের নিসাব ও পরিমাণ

যাকাতের নিছাব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'পাঁচ ওয়াসাক-এর কম উৎপন্ন ফসলের যাকাত নেই'। (বুখারী হা/১৪৮৪, 'যাকাত অধ্যায়)

আধুনিক পরিমাপ অনুসারে, পাঁচ ওয়াসাক হলো প্রায় ৯৪৮ কেজি বা প্রায় ২৪ মণ। ব্যক্তির ভূমিজ উৎপাদিত গম ও যব আলাদাভাবে নিসাবপূর্ণ না হয়ে উভয় প্রকারের ফসল একত্রে ৫ ওয়াসাক হলেও তার উশর দিতে হবে। অনুরূপভাবে যদি গম, যব, ধান, খেজুর ও কিসমিস

প্রত্যেক আইটেম এক ওয়াসাক করে উৎপাদিত হয় এবং সব মিলে পাঁচ ওয়াসাক পূর্ণ হয় তাহলেও যাকাত দিতে হবে। কিন্তু সম্মিলিতভাবে কম হলে, তার যাকাত দেয়া জরুরি নয়।

যেসব ফল-ফসলের উশর প্রদান করা আবশ্যক

উশরের পণ্য : যেসব পণ্য পচনশীল নয় বা যা দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায় সেসব পণ্যের উশর আদায় করতে হবে। ফল, ফসল, মধু, রেশমসহ বাংলাদেশের সব ভূমিজ উৎপাদনের উশর প্রদান আবশ্যক। শর্ত হলো, ভূমিজ উৎপাদনসমূহ প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান সামগ্রী হতে হবে। অতএব, গম, যব, ধান, খেজুর ও কিসমিস পাট, গম, আলু ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় কাঁচামাল, এমনকি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে উৎপাদিত শাক-সবজি, ফল-ফলাদি ও বাঁশেও উশর আসবে। তবে পচনশীল, ওজনযোগ্য নয়, ওষুধ বা খোশবু তৈরিতে ব্যবহৃত হয় এমন ফসলের উশর নাই।

শস্য-ফসল ও ফলের প্রদেয় যাকাতের পরিমাণ

এ বিষয়ে উম্মাহর ঐকমত্য রয়েছে যে, সেচবিহীন উৎপাদিত ফল-ফসলের যাকাত ১০%, আর সেচনির্ভর উৎপাদিত ফল-ফসলের যাকাত ৫% হারে উশর দিতে হবে। তবে ফিকাহ বিশারদগণ আরও স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যে জমিতে সেচ-সার, কীটনাশক ব্যতিরেকে প্রাকৃতিক উপায়ে ফসল উৎপাদিত হয় তার উশর ফসলের ১০% বা দশ ভাগের এক ভাগ। আর যে জমিতে সেচ-সার,কীটনাশক ইত্যাদিসহ আধুনিক উপায়ে ফসল উৎপাদিত হয় তার উশর ফসলের ২০% বা বিশ ভাগের এক ভাগ। উল্লেখ্য যে, বর্গাপ্রথার ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো জমির মালিক ও বর্গা চাষি প্রত্যেকে উৎপন্ন ফসলের নিজ অংশের উশর প্রদান করবেন।

উশর মৌসুমী, বার্ষিক নয়

উশর উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত। উৎপাদন না হলে উশর দিতে হবে না। অতএব, বছরে ফসল যতবার হবে ততবারই পৃথক পৃথকভাবে উশর আদায় করতে হবে, এমনকি বছরে ৪/৫ বার উৎপাদন হলে ৪/৫ বারই উশর আদায় করতে হবে। কেননা যাকাতের মতো উশরে বছর পূর্ণ হওয়ার শর্ত নেই। যদি কারো এক মওসুমে ২০০ মণ ধান উৎপন্ন হওয়ার পর তিনি উশর পরিশোধ করে দেন, তা হলে উক্ত ফসল

বছরের পর বছর ঘরে থাকলেও তাকে দ্বিতীয়বার ঐ উৎপাদনের উশর দিতে হবে না। উশরের উপাদান, উশর ফসলের আকারেও দেয়া যায় অথবা তার মূল্যও দেয়া যায়।

ঋণ ও উশর

ইমাম আহমাদ বলেন, কৃষক তার ফসলের জন্য যা ঋণ করেছে তা পরিশোধ করবে এবং বাকি ফসলের যাকাত প্রদান করবে। এটিই ইবনে আব্বাস (রা.) এর অভিমত। তবে ইবনে উমার (রা.) বলেন, কৃষক তার ফসলের জন্য যা ঋণ করেছে এবং নিজের পরিবারের জন্য যা খরচ করেছে তা প্রথমে পরিশোধ করবে। এরপর বাকি উৎপাদনের যাকাত প্রদান করবে। অন্যান্যদের মতে, ফসলের যাকাতের ক্ষেত্রে ঋণ ধার্তব্য নয়, বরং মোট উৎপাদনেরই যাকাত দিতে হবে। কারণ, উশরের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদিন কখনো ঋণ বাদ দেননি। তৎকালীন যাকাত সংগ্রহকারীগণ কখনো কাউকে প্রশ্ন করতেন না তাদের ঋণ আছে কি-না অথবা কী পরিমাণ ঋণ আছে। অতএব, একজন মুমিন তার মোট ভূমি-উৎপাদনের উশর দেবেন।

মধুর যাকাত

বর্তমান সময়ে মধুচাষ খুবই জনপ্রিয় ও লাভজনক হয়ে উঠেছে এবং এর মাধ্যমে অনেকে নিজেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করে নিয়েছেন। মধুর চাষ করলে তার উশর প্রদান করতে হবে। হযরত আবু সাইয়ারাহ (রা.) থেকে এ বিষয়ে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে, 'আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কিছু মৌমাছির চাষ আছে। তিনি বললেন, তুমি (উৎপাদিত মধুর) উশর আদায় করবে।'

বনূ মাত্য়ান-এর হিলাল নামক এক ব্যক্তি তার মধুর উশর নিয়ে রাসূলে করীম (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হল এবং 'সালবা' নামক উপত্যকা তাকে দেয়ার জন্যে প্রার্থনা জানাল। ফলে নবী করীম (সা.) সেই উপত্যকা তাকে দিয়েছিলেন। হযরত উমরের খিলাফত আমলে সুফিয়ান ইবনে ওহাব এ বিষয়ে আপত্তি করে লিখেছিলেন। জবাবে তিনি লিখেছেন : রাসূল (সা.)-এর যুগে যে উশর দেয়া হত, তা যদি সে

রীতিমত দিতে থাকে, তাহলে 'সালবা' তার কাছে থাকতে দেবে। অন্যথায় তা বৃষ্টির মাছি, যার ইচ্ছা খাবে। (ইসলামের যাকাত বিধান-১ম খণ্ড)

আধুনিক গবেষকগণ উল্লেখ করেছেন যে, মধু বা তরল পদার্থের ক্ষেত্রে লিটারের হিসাবে ইমাম আবু ইউসুফ, মালিক, শাফিয়ী ও আহমাদ (রহ.)-এর মতে এক 'সা' প্রায় ২.৭৫ লিটার। সে হিসাবে ৫ ওয়াসাকে ৮২৫ লিটার হয়। সুতরাং উল্লিখিত পরিমাণে মধু চাষ হলে এক দশমাংশ উশর হিসেবে দিতে হবে। ইউসূফ কারযাভীর মত হচ্ছে, যাবতীয় ব্যয় ও শ্রমের মূল্য বাদ দিয়ে অবশিষ্ট থেকে উশর নিতে হবে। (ইসলামের যাকাত বিধান-১ম খণ্ড)

মধুর যাকাত ফরয বলে যাঁরা মত দিয়েছেন, তাঁদের মত, দশ ভাগের এক ভাগ উশর দিতে হবে। হযরত ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি মধুর উশর পর্যায়ে বলেছেন যা খুব সহজে ও বিনা পরিশ্রমে পাওয়া যায়, তাতে উশর-এক দশমাংশ দিতে হবে। আর যা লালন ও পরিচর্যার মাধ্যমে উৎপাদিত হবে, তার অর্ধ-উশর দিতে হবে।

৬. অন্যান্য সম্পদের যাকাত

গুপ্তধনের যাকাত : অধিকাংশ আলিম বলেছেন, গুপ্তধন বলতে জমিনে পুঁতে রাখা সব সম্পদকে বুঝানো হয়, যেমন প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু, স্বর্ণ, রূপা, সীসা, পিতল, বাসন-কোসন ও অন্যান্য আসবাবপত্র ইত্যাদি। গুপ্তধন থেকে যাকাত দেয়ার পরিমাণ : নবী (সা.) বলেছেন, 'গুপ্তধনের যাকাত এক পঞ্চমাংশ' (সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম)। যতটুকুই পাওয়া যাক না কেন তার পাঁচ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে।

তৈজসপত্রের যাকাত : কোনো ব্যক্তির দৈনন্দিন ব্যবহারের লক্ষ্যে রক্ষিত রূপার বা সোনার থালা-বাসন ইত্যাদির ওজন ন্যূনতম নিসাব পরিমাণের হলে বা অন্যান্য সম্পদের সাথে মিলিয়ে প্রতি বারো মাস পরপর এসবের জন্য ওই ব্যক্তির ওপর যাকাত আদায় করা ফরয এবং তা স্বর্ণ ও রৌপ্যের হিসাবেই যাকাত দিতে হবে।

পোশাক-পরিচ্ছদের যাকাত : মূল্য ও পরিমাণ নির্বিশেষে পোশাক-পরিচ্ছদ যাকাতের আওতাবহির্ভূত। তবে পোশাক-পরিচ্ছদে যদি সোনা-রূপার সূচিকর্ম বা এসব ধাতুতে নির্মিত সুতোর ব্যবহার থাকে তাহলে সংশ্লিষ্ট অংশগুলোর জন্য প্রতি বারো মাস পরপর যাকাত আদায় করতে হবে।

৭. ঋণদাতার যাকাতের বিধান

ঋণদাতা নিম্নোক্ত শর্তালোকে নিসাব ও বছর পূর্তি সাপেক্ষে প্রদত্ত ঋণের যাকাত আলাদা অথবা যাকাতযোগ্য অন্যান্য অর্থের সাথে মিলিয়ে যাকাত আদায় করবেন :

ক. ঋণপ্রদত্ত অর্থ সন্দেহাতীতভাবে যাকাত বর্ষের মধ্যেই ফেরত পাবেন অথবা নিশ্চিতভাবেই কিছুদিনের মধ্যে ফেরত পাচ্ছেন, তবে সেই ঋণের অর্থের ওপর যাকাত প্রযোজ্য হবে।

খ. ঋণদাতা ঋণের অর্থ ফেরত পাবেন; কিন্তু কবে-কখন ফেরত পাবেন তা নিশ্চিত নয়। ঋণপ্রদত্ত অর্থ ফেরত পাওয়ার পর বিগত বছরসমূহের যাকাত হিসাব করে দিয়ে দেবেন। (ইসলামের যাকাত বিধান ; ইউসুফ আল কারযাভী)

গ. যদি ঋণের অর্থ ফেরত পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, এক্ষেত্রে ঋণের অর্থের ওপর যাকাত প্রযোজ্য হবে না। তবে ভবিষ্যতে যদি উক্ত অর্থ ফেরত পাওয়া যায় তাহলে (এক বছরের) যাকাত প্রদান করতে হবে। (ইসলামের যাকাত বিধান; ইউসুফ আল কারযাভী)

ঘ. তেমনিভাবে, মানুষের নিকট যাদের বকেয়া রয়েছে, যেমন বকেয়া দেনমোহর যা স্বামী এখনও স্ত্রীকে প্রদান করেনি। এসব সম্পদ হাতে পাওয়ার পর নিসাব ও বছর পূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে তার ওপর এক বছরের যাকাত ওয়াজিব হবে।

৮. ঋণগ্রহীতার যাকাতের বিধান

ক. ঋণগ্রহীতার ঋণের টাকা মোট যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে। কিন্তু যদি ঋণগ্রহীতার মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্থায়ী

সম্পত্তি থাকে যা দ্বারা এরূপ ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম, তবে উক্ত ঋণ যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে না।

খ. স্থাবর সম্পদের উপর কিস্তিভিত্তিক ঋণ (যেমন-হাউজিং লোন ইত্যাদি) যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে না। তবে বার্ষিক কিস্তির টাকা অপরিশোধিত থাকলে তা যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে।

গ. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি নিসাব পরিমাণ স্বর্ণ, রূপা অথবা ব্যবসায়ী পণ্যের মালিক হন, তবে তিনি তার সম্পদের যাকাত দেবেন, ঋণের কারণে যাকাত মওকুফ হবে না।

ঘ. যদি যাকাত প্রদানের সময় ঋণ পরিশোধের নির্দিষ্ট মেয়াদ চলে আসে, তবে তিনি আগে ঋণ পরিশোধ করবেন। ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পদ থেকে যাকাত প্রদান করবেন। আর যাকাতের নিসাব থেকে কমে গেলে সেই সম্পদের যাকাত দিতে হবে না।

যাকাত বিতরণের খাতসমূহ

প্রথম খাত : ফকীর (ফুকারা) : 'ফুকারা' হলেন এমন গরিব মানুষ যে তার তেমন আয় নেই বা থাকলেও তা এতই সামান্য যে তা দিয়ে সে তার মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না।

দ্বিতীয় খাত : মিসকিন :'মিসকিন' হলো সেই ব্যক্তি যার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আছে এবং তাতে সে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়েও জীবিকায়নের জন্য পর্যাপ্ত আয় হয় না বা কঠোর পরিশ্রম করেও অন্নসংস্থানে ব্যর্থ হয়। অথচ সে তার দুরাবস্থা প্রকাশও করে না।

তৃতীয় খাত : 'আমীলীন' : যাকাত ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ যাকাত তহবিলের অন্যতম প্রাপক।

চতুর্থ খাত : মুয়াল্লাফাতুল কুলুব (অন্তর জয় করার জন্য) : 'মুয়াল্লাফাতুল কুলূবুহুম' মানে 'তাদের ঝুঁকে যাওয়া অন্তরকে' যাকাতের একটি অংশ

দাও। কোনো অমুসলিমের অন্তর ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করা জরুরি বিবেচিত হলে তাকে যাকাত দেয়া বৈধ।

পঞ্চম খাত : রিক্বাব (শৃঙ্খলমুক্ত করা) : দাস-দাসীকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করা।

ষষ্ঠ খাত : গারিমীন (ঋণমুক্ত করা) : 'গারিমীন' শব্দটির অর্থ ঋণী। ঋণগ্রস্ত মুসলিম ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যিনি নিজের ও পরিবারের মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

সপ্তম খাত : ফী সাবীলিল্লাহ (আল্লাহর পথে ব্যয় করা) : 'ফী সাবীলিল্লাহ'র অর্থ 'আল্লাহর পথে'। অর্থাৎ ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রচার-প্রসারের জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা।

অষ্টম খাত : ইবনুস সাবিল 'ইবনুস সাবিল' দ্বারা 'মুসাফির' বুঝানো হয়েছে। মুসাফির ব্যক্তিকে সফর পূর্ণ করে দেশে ফেরার জন্য যাকাত দেয়া বৈধ, যদিও সে নিজ দেশে ধনী।

(পাঠকদের যাকাতের মাসলা-মাসায়েল জানার সুবিধার্থে পরিশিষ্ট-ক এর পুরো বিষয়বস্তু সিজেডএম কর্তৃক প্রকাশিত 'যাকাতের বিধিবিধান' বই থেকে নেয়া হয়েছে)

World Zakat Performance Index

Dimension	Variable	Scale				
		1 (Bad)	2 (Poor)	3 (Fair)	4 (Good)	5 (Excellent)
Legal Framework	The presence of a legal framework for the zakat/charity organisation	The country, state, religious council or local community does not have a legal framework for zakat or charity supervision	-	-	-	The country, state, religious council or local community hasa legal framework for zakat orcharity supervision
	The presence of permissible activities in zakat/charity regulation	The country, state or religious council has a legal framework for zakat/charity management but it does not clearly regulate zakat/charity permissible activities	-	-	-	The country, state or religious council has a legal framework for zakat/charity management which clearly regulates zakat/charity permissible activities
	The presence of licensing criteria regulation for zakat/charity institutions	The country, state, religious council or local community does not have a legal framework for zakat/charity supervision (does not have/unclear)	-	-	-	The country, state or religious council or local community has a legal framework for zakat/charity supervision which clearly states the licensing criteria or parameters for zakatoperations
Zakat Supervision	Supervisor yApproach	The zakat/charity supervisor does not have a clear framework or process for ensuring that zakat management is fully	-	-	-	The zakat or charity supervisor has a clear framework or process for ensuring zakat management is fully compliant with legal requirements

		compliant with legal requirements				
	Supervisory Techniques andTools	The zakat or charity supervisor does not have supervisory techniques and tools to evaluate the performance of the zakat/charity institution	-	The zakat or charity supervisor has supervisory techniques and tools to evaluate the performance of the zakat/charity institution	-	The zakat or charity supervisor has supervisory techniques and tools to evaluate the performance of the zakat/ charity institution and implements them regularly
	Supervisor yReporting	The zakat/charity supervisor does not collect and review the zakat/charity institution's performance report	-	The zakat/charity supervisor collects and reviews the zakat/charity institution's erformance	-	The zakat/charity supervisor collects and reviews the zakat/charity institution's performance and publishes the results publicly
Zakat Reporting	Financial Statements	Financial statements are notavailable	-	Financial statements are available but unaudited	-	Financial statements are available and audited
	Financial Transparency	Financial reports are notpublished	-	Financial reports are not published periodically	-	Financial reports are publishedregularly
	The presence of an Annual Report	An annual report is notavailable	-	-	-	An annual report is available
Zakat	Zakat Collection Management	Not available	-	A standard procedure for zakat collection management is available but uncertified	-	A standard procedure for zakat collection management is available and certified

Collection	Zakat Collection Growth	Zakat collection growth of0-9%	-	Zakat collection growthof 10%-20%	-	Zakat collection growth is >20%
	Risk Management in Zakat Collection	Not available	-	A standard procedure for risk management in zakat collection is available but uncertified	-	A standard procedure for risk management in zakat collection is available and certified
	Zakat Literacy Index	Low level (Score : 0-60)	-	Moderate level (Score :61-80)	-	High level (Score : 81-100)

Dimension	Variable	Scale				
		1 (Bad)	2 (Poor)	3 (Fair)	4 (Good)	5 (Excellent)
	Donor or Muzaki Database	Not available	-	A database of muzaki or donors is available but not updated	-	A database of muzaki or donors is available and updated
Zakat	Disbursement Management	A standard procedure for zakat disbursement is notavailable	-	A standard procedure for zakat disbursement is available but uncertified	-	A standard procedure for zakat disbursement is available and certified
	Allocation to Collection Ratio	The allocation to collection ratio is <20% (not	The allocation to collection ratio is	The allocation to collection ratio is between 50% and	The allocation to collection	The allocation to collection ratio is equal to or greater

Disbursement		effective)	between 20% and 49% (below expectation)	69% (fairly effective)	ratio is between 70% and 89% (effective)	than 90% (highly effective)
	The Presence of a Zakat Impact Assessment Report	Not available	-	A report is available but not published	-	A report is available andpublished
	Risk Management in Zakat Disbursement	Not available	-	A standard procedure for risk management in zakat disbursement is available but uncertified	-	A standard procedure for risk management in zakat disbursement is available andcertified
	Mustahik or beneficiaries database	Not available	-	A database of mustahik or beneficiaries is available but not updated	-	A database of musathik or beneficiaries is available andupdated

সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. ইউসুফ আল কারযাভী, *ইসলামের যাকাত বিধান* (১ম ও ২য় খণ্ড), অনুবাদ : মাওলানা আবদুর রহিম, (১৯৮৩), খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা

২. ইউসুফ আল কারযাভী, *অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে যাকাতের ভূমিকা*, অনুবাদ : মাহফুজুর রহমান, (২০২০), প্রচ্ছদ প্রকাশনী, ঢাকা

৩. ইউসুফ আল কারযাভী, *ইসলামে দারিদ্র্যবিমোচন*, ঢাকা

৪. এ. উমর চাপরা, *ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থশাস্ত্রের ভবিষ্যত*, অনুবাদ : মাহমুদ আহমেদ, (২০১১), বিআইআইটি, ঢাকা

৫. এ. উমর চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, অনুবাদ : মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব, খন্দকার রাশেদুল হক, সালেহউদ্দিন ও আমানুল্লাহ, (২০০০), বিআইআইটি, ঢাকা

৬. এ. উমর চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*, অনুবাদ : মাহমুদ আহমেদ, (২০০০), বিআইআইটি, ঢাকা

৭. সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট, *যাকাতের বিধি-বিধান*, (২০২০), ঢাকা

৮. Muhammad Zulfiqar, *Zakat According to the Quran & Sunnah, A Comprehensive Study of Zakat in Modern Perspective* , (2011) , Dar-Us- Salam , Makkah.

৯. Abd Halim Mohd Noor & Others (edit), *Zakat and Contemporary Management : Multi-facet Issues and Challenges* (2013), Zakat Research Institute of Malaysia, University Teknology MARA, Melaka, Malaysia.

১০. Abd Halim Mohd Noor & Others (Edit) *Contemporary Issues and Development in Islamic Social Finance*, (2017), Mashi Publication, Selangor, Malaysia.

১১. Norani Mohammad & Others (edit), *Islamic Philanthropy* (2013), Malaysia.

১২. Fauzia Hamid, *Horizon of Zakat Beyond the Realm & Religious Tax*, Islamic & Economics Research Bureau, (2019), Dhaka.

১৩. Muhammad Zohurul Islam & M Kabir Hasan, *Zakat Administration, Principles and Contemporary Practice*, (2022). Bangladesh Institute of Islamic Though, Dhaka.

১৪. (MV.) Zohurul Islam, AL-Zakah A Handbook of Zakah Administration, (1999), Bangladesh Institute of Islamic Thought, Dhaka

১৫. M Kabir Hasan, *Exploring Potential of Zakat in Bangladesh*, (2022), Center for Zakat Management (CZM), Dhaka

১৬. Technical Notes on *Zakat Core Principles*, (2010) Islamic Development Bank, Bank Indonesia, BAZNAS Indonesia & World Zakat & Waqf Forum , Jakarta
১৭. Technical Notes on *Good Amil Governance* (2017) Islamic Development Bank, Bank Indonesia, BAZNAS Indonesia & World Zakat & Waqf Forum , Jakarta
১৮. Technical Notes on *Zakat Risk Management*, (2012) Islamic Development Bank, Bank Indonesia, BAZNAS Indonesia & World Zakat & Waqf Forum , Jakarta
১৯. *World Zakat Performance Index*: *A Conceptual Framework* (2022) World Zakat & Waqf Forum, Indonesia
২০. *Technical Note Shariah Control and Internal Audit (2019) Shariah Audit Index*, (2020) World Zakat & Waqf Forum, Indonesia
২১. Anup Shaha, *Poverty Facts and Stats (2013) Global Issues : Social, Political Economic and Environmental Issues That Affect US All, "https ://www.globalissues.org/article/26/poverty-facts-and-stats">*
২২. Ministry of Planning, Government of Bangladesh, *Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP), (2005), Dhaka*
২৩. (MV.) Kabir Hassan, *An Integrated Islamic Poverty Alleviation Model*, (2010), University of New Orleans, USA
২৪. (MV.) Kabir Hassan & others, *Exploring Potential of Zakat in Bangladesh* (2022), Center for Zakat Management, Dhaka
২৫. Habib Ahmed, Occassional Paper-8, Islamic Development Bank (2004) & Islamic Research & Training Institute, Jeddah, KSA
২৬. Professor Muhammad Yunus, The Poor as the Engine of Development, The Washington Quarterly, Autumn, (1987)
২৭. Dr. Mohammad Ayub Miah, Zakat Fair Souvenir 2016, Center for zakat Management, Dhaka (2016)
২৮. Brochure of Center for Zakat Management, Exploring Potential of Zakat, Dhaka (2016)
২৯. Technical Notes Shariah Control and Internal Audit (2019), Bank Indonesia, BAZNAS Indonesia & World Zakat & Waqf Forum , Jakarta
৩০. Bateman (MV.) (2014). The Rise And Fall of Muhammad Yunus and the Microcredit Model, a freelance consultant on

local economic development and Visiting Professor of Economics at Juraj Dobrila at Pula University, Croatia.

৩১. Nadzri F. A. A., AbdRahman R. and Omar Normah (2012). International Journal of Arts and Commerce,

৩২. Obaidullah (MV.)"(2008). Introduction to Islamic Microfinance, Ibf Net : The Islamic Business and Finance Network.

৩৩. Sahl Ibrahim (MV.) G. (1997). Challenging the Concept of Poverty : Does Islam Provides a Solution? Sudan. Economic and Social Research Institute of the National Centre for Research.

৩৪. Sarder (MV.) R. & Nabi G. (2010). Dynamics of Micro Finance Programs in Poverty Alleviation in Bangladesh : Present Status, Challenges and Policy Actions. Dhaka. Bangladesh Bank.

৩৫. Sobhan R. & Bhattacharya D. (1990). From Aid Dependence to SelfReliance Development Options for Bangladesh, Dhaka. BIDS.

৩৬. Hossain Zillur Rahman, Proverty Gradutaiton Through Zakat-Based Programs (2018), PPRC, CZM, AK Khan Foundation, Dhaka.

৩৭. Mohammad Ayub Miah, Effectiveness of Zakat-based Poverty Alleviation Program: Evidence of Bangladesh (2021), International Journal of Zakat in June 2021 (Vol. 6, No. 2), Jakarta, Indonesia.

অভিমত

ইসলামে যাকাত অন্যতম একটি বাধ্যতামূলক (ফরয) ইবাদাত। সুতরাং প্রত্যেক মুসলিম বিশেষ করে সম্পদশালী যাকাতদাতা মুসলিমকে যাকাত আদায়ের শরয়ী মাসয়ালা-মাসায়েল যেমন জানা প্রয়োজন, তেমনি যাকাতের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কেও অবহিত হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশে যাকাত প্রদান ও বিতরণ কার্যক্রমে নানারকম বিভ্রান্তি ও অজ্ঞতা পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত: সঠিক ও কার্যকর পন্থায় যাকাত ব্যবস্থাপনা ও তার সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে আমরা অনেকেই বিস্তারিত জানি না। বাংলাদেশে ব্যাপক সংখ্যক পরিবার এখনো দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে এবং তারা অবশ্যই যাকাত পাওয়ার হকদার (মুস্তাহিক)। ধনবান ব্যক্তিদের সম্পদে তাদের অধিকার রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন, 'তাদের (ধনীদের) সম্পদে রয়েছে নি:স্ব ও বঞ্চিতদের অধিকার (সূরাহ যারিয়াত:১৯)। যাকাত যদি বঞ্চিতদের মধ্যে পরিকল্পিত ও কার্যকরভাবে বিতরণ করা হয় তাহলে সমাজ থেকে টেকসইভাবেই দারিদ্রবিমোচন করা যেতে পারে। সুতরাং যাকাতকে দারিদ্র্য বিমোচনের একটি কার্যকর টুল হিসেবে ব্যবহারের জন্য ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তগুলোকে সামনে রেখে আমাদের সমাজের প্রেক্ষাপটে কর্মকৌশল প্রণয়ন করা প্রয়োজন। সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম)-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব সুদীর্ঘ এক যুগেরও বেশি যাকাতের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার যে বিশাল অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তার আলোকে 'যাকাতের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা ও দারিদ্র্যবিমোচন কৌশল' শিরোনামে যে গ্রন্থ রচনা করেছেন, তা অত্যন্ত সময়োপযোগী একটি পদক্ষেপ। তাঁর রচিত বইটি যাকাত দাতা (মুযাক্কী), যাকাত ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারক, সরকারি নীতি-নির্ধারক, যাকাত কর্মচারী, গবেষক, শিক্ষাবিদ সকলের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি। আমার মনে হয়, বাংলা ভাষায় যাকাতের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত এরূপ পুস্তক এটাই প্রথম। যারা যাকাতের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দারিদ্র্যবিমোচন ও মানবতার কল্যাণে কাজ করছেন বা করতে চান তাদের জন্য এ বইটি দিক-নির্দেশনা দিতে পারবে বলে আমি মনে করি। সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক যাকাত ব্যবস্থাপনার যে সূচনা করেছে, তা থেকে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা নিয়ে অন্যরাও যাকাত আন্দোলনে অর্থবহ অবদান রাখতে সক্ষম হবে, এ দোয়া করি।

বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ
চেয়ারম্যান
সিজেডএম এডভাইজরী বোর্ড